সম্পাদক• শ্রীঅজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

কালবৈশাখী

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহা রবে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক্ তবে !

—রবীন্দ্রনাথ

কালবৈশাখী

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়
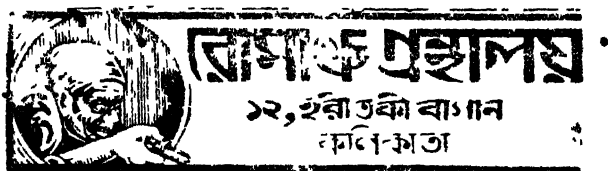
সাঙ্কো পাঞ্জার কয়েকখানি বই

❋

প্রলয়ের আলো	—	—	৪৲
সাঙ্কো পাঞ্জা	—	—	৩৲
সাঙ্কো পাঞ্জার প্রতিহিংসা	—	—	৩৲
রন্ধ্রগত শনি	—	—	৩৲
কালবৈশাখী	—	—	২৷৽
নীলবর্ণ শৃগাল	—	—	২৷৽
সর্ব্বনাশা	—	—	২৲
সাঙ্কো পাঞ্জার পুনরভিযান	—	—	২৲
দ্বৈরথ	—	—	২৲

❋

কালবৈশাখী

এক

চালাও—চালাও…জোরে—আরো জোরে।

কিন্তু পুলিশ?

পুলিশকে মিছে ভয় করতে যাব কেন?

কিন্তু আমি?

তোমারও ভয়ের কোন কারণ নেই। চালাও গাড়ী….আরো জোরে, আরো জোরে। নাই বা মানলে [illegible] বাঁধন? তার জন্যে যদি জবাবদিহি করতে হয়, করব আমি।

কিন্তু আপনি…

আমার পরিচয় জানতে চাও? জেনে রাখ এবং জেনে রাখাই উচিত—আমি প্রতুল লাহিড়ী।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করিয়া গাড়ীর ড্রাইভার বলিয়া উঠিল: আপনি প্রতুল লাহিড়ী—ডিটেকটিভ প্রতুল লাহিড়ী?

হ্যাঁ আমি। [illegible] দৃঢ়তার সহিত প্রতুল বলিল, চালাও, চালাও, আরো জোরে—আরো জোরে। এই মুহূর্তে আমায় কমিশনারের কাছে যেতে হবে। কালো পাঞ্জাকে আমি বন্দী করেছি….

কালবৈশাখী

কলিকাতার প্রশস্ত একটি রাজপথের বুকের উপর দিয়া গাড়ী উল্কা-বেগেই ছুটিয়া চলিল। সমস্ত পথচারীরা পথ ছাড়িয়া দিল, চলন্ত যান-বাহনগুলোও সভয়-সঙ্কোচে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাঙ্কো পাঞ্জা—দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-সম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জা আজ বন্দী। লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হিংস্র পশুর মতই নিঃসহায়। যার অত্যাচারে দেশবাসী সন্ত্রস্ত....

ড্রাইভারের চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হইল।

প্রতুল পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল, আর জোর নেই ড্রাইভার? গতির শেষ সীমায় পৌঁচেচ?

আরও যতটুকু সম্ভব গতি বাড়াইয়া দিয়া ড্রাইভার আপন মনেই বলিয়া উঠিল, সাঙ্কো পাঞ্জা—সাঙ্কো পাঞ্জা আজ বন্দী, আর আপনি—আপনি প্রতুল বাবু...

প্রতুলকে কে না চেনে? সাঙ্কো পাঞ্জাই বা কার অপরিচিত? ডিটেকটিভ প্রতুল লাহিড়ীকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য ইতঃপূর্ব্বে অনেক ট্যাক্সি-চালকের জীবনেই ঘটিয়াছে, কিন্তু দস্যু-সম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জার ধৃতকারী প্রতুল লাহিড়ীকে সেই-ই আজ প্রথম লইয়া চলিয়াছে কমিশনারের অফিসে—ভাবিয়া ড্রাইভারের বুকখানা অপরিসীম উল্লাসে ও গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল।

পুলিশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল, সার্জ্জেণ্টের দল মোটর-বাইক করিয়া তার অনুসরণ করিতে লাগিল, ড্রাইভার কোন দিকে চাহিল না, কোন বাধা মানিল না, গাড়ী ছুটিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত..

ছুটিতে ছুটিতে সহসা এক সময় গাড়ীর গতিবেগ কমিয়া আসিল। সম্মুখেই পুলিশ-অফিস। ড্রাইভার সভয়ে একবার চারিদিকে চোখ বুলাইয়া দেখিয়া লইল, কোথায় পুলিশ, আর কোথায়ই বা তার অনুসরণকারী সার্জেন্টের দল? পিছাইয়া পড়িয়াছে কত দূরে?

লাফাইয়া প্রতুল গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ড্রাইভারের হাতে খান দুই নোট গুঁজিয়া দিয়া সে ছুটিল কমিশনারের ঘরের দিকে।

সিঁড়ির সামনেই যে সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরীটি দাঁড়াইয়াছিল, উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতুল তাকে জিজ্ঞাসা করিল, কমিশনার সাহেব আছেন? কমিশনার সাহেব?

প্রহরীটি প্রতুলের এই উত্তেজনার কোন কারণই বুঝিল না; হঠাৎ থতমত খাইয়া গিয়া কহিল, হুজুর....

বাধা দিয়া প্রতুল কহিল, হুজুর নয়, শুধু বলো কমিশনার সাহেব আছেন কিনা তাঁর ঘরে?

মানে, আমার মনে হয়....

মানে নয়, মনে নয়, শুধু বলো কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন কি না....

প্রহরীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইতে চাহিল না।

প্রতুলও আর কোন কথা না বলিয়া এক এক লাফে সিঁড়ির তিন চারিটা ধাপ অতিক্রম করিয়া একেবারে সোজা কমিশনারের ঘরের সামনে আসিয়া হাজির হইল।

সেখানেও ছিল একজন পুলিশ-প্রহরী। কিন্তু সে তখন প্রহরার কাজে নিযুক্ত ছিল না, ছিল নিদ্রা দেবীর আরাধনায় মগ্ন।

প্রতুলের সেদিকে তখন ভ্রূক্ষেপ ছিল না; জিজ্ঞাসা করিল, কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন?

কোন উত্তর নাই; প্রহরীর মাথাটা তখন নীচের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছে।

প্রতুলের আর ধৈর্য্য রহিল না; দুই হাতে প্রহরীর কাঁধটা ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া কহিল, কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন?

মুহূর্ত্তেই প্রহরীটির ঘুমের নেশা টুটিয়া গেল। বিহ্বল হতবুদ্ধির ন্যায় প্রতুলের মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া কহিল, আপনি কি—আপনি কি...

প্রতুল অসহিষ্ণু কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিল, কমিশনার সাহেব ভেতরে আছেন?

আছেন হুজুর, কিন্তু....

আর কোন কথা না, তুমি আমার কার্ডখানা নিয়ে যাও তাঁর কাছে। পকেট হইতে কার্ড একখানা বাহির করিয়া প্রতুল তার মুখের সামনে ধরিল।

প্রহরী কিন্তু কার্ডখানা স্পর্শ করিল না; কহিল, আমার ওপর হুকুম আছে....

কোন কথা আর শুনতে চাইনি....প্রহরীটীকে অতিক্রম করিয়া প্রতুল দরজায় সজোরে করাঘাত করিল।

কিন্তু দরজা বন্ধ, বাহির হইতে চাবি দেওয়া।

বাঘের মত লাফ দিয়া প্রতুল একেবারে প্রহরীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, চাবিটা খুলে দাও চট্ ক'রে।

হুকুম নেই, হুজুর !

আমি বলছি...

আপনি বলতে পারেন, কিন্তু সাহেবের হুকুম...;

সাহেবের হুকুম আমার জন্যে নয়। তোমার সমস্ত দায়িত্বই আমি ঘাড় পেতে নিচ্চি···

দায়িত্ব না হয় নিলেন, কিন্তু....

কিন্তু-টিন্তু—কিচ্ছু নেই এর মধ্যে। বড্ড দরকার—বড্ড দরকার তোমার সাহেবের সঙ্গে....এই মাত্র আমি সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দী করে এসেছি ···

সভয়ে কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া প্রহরীটী বলিয়া উঠিল, সাঙ্কো পাঞ্জা !....

হ্যাঁ, সাঙ্কো পাঞ্জা।

তবু আমি কি করব, বুঝতে পারছি না হুজুর !

প্রতুলের ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনি সে প্রহরীর গালে ঠাস্-ঠাস্ করিয়া গোটাকত চড় কসাইয়া দেয়। কিন্তু তাহা হইলেই বা কি হইবে ? প্রতিটী মুহূর্ত্তই এখন তার কাছে মূল্যবান। কথা কাটাকাটি করিয়া নষ্ট করিবার মত সময় তার নাই। সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দীই নয় করিয়াছে সে, কিন্তু এখনও কত কাজ বাকী এবং সে কি ভীষণ দায়ীত্বপূর্ণ ! কারাকক্ষে রাখিবার এবং এমন ভাবে রাখিবার সুব্যবস্থা করা—যাতে সে আর চোখে ধূলি দিয়া পলাইতে না পারে....

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রতুলের বেশী সময়ের আবশ্যক হয় না। যখন সে সত্যই বুঝিতে পারিল, চেঁচামেচি করিয়া কোন ফল নাই, কাজ

তার যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, প্রহরী কিছুতেই কমিশনারের আদেশ লঙ্ঘন করিবে না, তখনই সে পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া ছুড়িল—এক, দুই, তিন....

গুলি ছোড়ার তাৎপর্য ধরিতে না পারিয়া প্রহরীটি হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন স্বয়ং কমিশনার। মুখে তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন। গুলি ছোড়ার যথার্থ হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন প্রতুলকে। বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, প্রতুলবাবু যে!

প্রতুল তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তি করার প্রয়োজন বুঝিয়াই কহিল, আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যেই বাইরে থেকে আমি গুলি ছুড়েছি...

কিন্তু কেন?

আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন এবং সেটা এই মুহূর্তেই।

ভেতরে আসুন আপনি।

প্রতুল ভিতরে প্রবেশ করিতেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কমিশনার অধীর আগ্রহে কহিলেন, কি ব্যাপার বলুন ত?

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই প্রতুল সুরু করিল, সাঙ্কো পাঞ্জাকে আমি বন্দী করেছি।

কমিশনার অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কহিলেন, বন্দী করেছেন! সাঙ্কো পাঞ্জাকে!

তাঁর সংশয়োত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্য হইয়া প্রতুল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, সাঙ্কো পাঞ্জাকে।

অসম্ভব! কমিশনারের মুখে ফুটিয়া উঠিল অবিশ্বাসের হাসি হাসিটা এতই সুস্পষ্ট যে, পলকের দৃষ্টিপাতেই প্রতুলের তা লক্ষ্যগোচর হইল। সে অবাক হইয়া কহিল, অসম্ভব! এ আপনি বলছেন কি?" আমি নিজের হাতে তাকে বন্দী করেছি।

এত বড় কথাটার উপরও কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া কমিশনার কহিলেন, বন্দী করেছেন যদি, কোথায় সে?

আনন্দবাবু আর বিশু মোটরে করে নিয়ে আসছে তাকে। আমার তাড়াতাড়ি চলে আসার কারণ আর কিছুই নয়, আপনার সঙ্গে যুক্তি করে তার উপযুক্ত কারাকক্ষের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাখতে চাই।

আনন্দবাবু আর বিশু ছাড়া আর কেউ আছে তার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। জনপনেরো ষোলো সশস্ত্র প্রহরী! সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করা হয়েছে, দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই।

কি রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছেন শুনি?

আগে আগে আসছে একখানা লরী, তাতে আটজন সশস্ত্র প্রহরী পিস্তল উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝের গাড়ীতে বিশু আর সাঙ্কো পাঞ্জা। শেষের গাড়ীতে আনন্দবাবু আর আটজন সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী। সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি সাঙ্কো পাঞ্জার ওপর নিবদ্ধ। এ আয়োজনের পরও কি আপনার মনে হয়, সে পালাবার সুযোগ খুজে নেবে? যদি খোঁজেই, তাহলে সতেরোটা পিস্তল এক সঙ্গে গর্জ্জে উঠবে....

বর্ণনাটা শেষ করিয়া প্রতুল কমিশনারের দিকে একবার তাকাইল। সন্দেহের যে মেঘটা তাঁর মুখে কালো ছায়া বিস্তার করিয়াছিল, সেটা তখনও অপসৃত হয় নাই। প্রতুল চুপ করিতেই উদ্বেগাকুল কণ্ঠে

কহিলেন, কিন্তু আপনাদের এত বড় আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে সাঙ্কো পাঞ্জা পালিয়েছে…

প্রতুল যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল,সাঙ্কো পাঞ্জা পালিয়েছে! তার মানে?

তার মানে আর কিছুই নয়, সাঙ্কো পাঞ্জা আপনাদের চেয়েও চতুর, আপনাদের চেয়েও কৌশলী। ছি! ছি! কি লজ্জা, কি ঘৃণা, কি পরিতাপের কথা বলুন ত প্রতুলবাবু!

কমিশনারের কথাগুলা যেন আকস্মিক বজ্রপাতের মতই প্রতুলের চেতনা লোপ করিয়া দিল। বহুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন করিয়া লইয়া সে কহিল, লজ্জা, ঘৃণা, পরিতাপ—এসব কি বলছেন আপনি?

কমিশনার উদ্বেগ-গম্ভীর মুখে টেবিলের ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, প্রতুলের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন, আশা করি, এই চিঠিখানা পড়লেই আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকবে না।

প্রতুল ব্যগ্র হস্তে চিঠিখানা তুলিয়া লইল।

কমিশনার বলিলেন, পড়বার আগে, চিঠিখানার ইতিহাস জানা দরকার আপনার। যেমন বসে আছি, কোয়ার্টার তিনেক আগেও ঠিক এই জায়গায় এইভাবেই বসেছিলুম, হঠাৎ কানে এল ঝন্ ঝন্ একটা শব্দ। ফিরে তাকাতেই দেখি, জানলার ওই শার্সিটা ভেঙে ঘরে ঢুকল এক টুকরো পাথর। মনে করলুম, কোন দুষ্টু ছেলের কাজ বুঝি।

[illegible] না কি করে সত্যি [illegible] চারদিকে পুলিশ-প্রহরী....

পাথরের টুকরোটার দিকে [illegible] পড়তেই আমার সে ভুল গেল

ভেঙে। বুঝলুম, ওই পত্রখানার বাহকরূপেই ওটা আমার ঘরে ঢুকেছে। পত্রখানা পড়লুম—বার বার পড়লুম, ধারণা হল, কেউ হয়ত পরিহাস করেছে এবং এই ধারণাই এতক্ষণ বদ্ধমূল ছিল, আপনি আসতেই গেল বদলে।

নিদারুণ উত্তেজনায় প্রতুল চিঠিখানার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে লাগিল :

সুযোগ্য পুলিশ কমিশনার

মহোদয় সমীপে—

মহাশয়, আমি আজ বন্দী। আমার এই হীন বন্দীত্বের মূলে আছে আপনাদের চিরপরিচিত গোয়েন্দা-প্রবর প্রতুল লাহিড়ী, তার বন্ধু বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবং ডিটেকটিভ ইন্‌সপেক্টর আনন্দমোহন রায়। আনন্দমোহনকে প্রাণীবিশেষের সহিতই আমি তুলনা করি, তাই সে প্রতুলকে দিয়েছিল এ বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা।

আমার পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ, সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরীর উদ্যত পিস্তলের সামনে বসিয়ে আমাকে পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আপনি, ব্যাপারটা আমার কাছে কি বিষম বিরক্তিকরই না লাগছে!

আমি বন্দী, পুলিশ-প্রহরী বেষ্টিত হয়ে চলেছি পুলিশ-অফিসে, তবু আপনাকে এই পত্রখানা লিখছি এবং এটা পৌঁছে দেবার ভারও নিয়েছি নিজের হাতে। সন্দেহ হয়, নিজে না পৌঁছে দিলে হয়ত এটা যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছতে নাও পারে!

পত্রখানা লিখছি আপনাকে কতগুলো কথা জানাতে। কথাগুলো

আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং আশা করি, আপনি এদের যোগ্যতানুরূপ গুরুত্বই দেবেন।

এবার আমার বক্তব্যের অবতারণা করি। প্রথমতঃ আমার বন্দীত্ব-মোচন। দ্বিতীয়তঃ আমি জ্বররোগাক্রান্ত, আমার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। ব্যবস্থাটার সম্বন্ধে আমি এই বলতে চাই, আপনাদের নিযুক্ত ডাক্তারদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না; আমার জন্যে আপনি 'ক্যালকাটা কলেজ অব মেডিসিন' থেকে একজন ডাক্তার আনবেন ডাকিয়ে। সে সময় যদি আমার দেহের উত্তাপ না থাকে, তাহলে আমার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থাও করবেন। আহার সমাধার পরই চাই ভাল একটা ট্যাক্সি। তাতে চড়ে আমি আমার ইচ্ছামত স্থানে যাব। এসব কাজগুলো রাত্রি দশটার মধ্যেই হবে শেষ।

প্রসঙ্গক্রমে আপনাকে লিখতে আমি বাধ্য হচ্চি, ইচ্ছাতেই হোক্ আর অনিচ্ছাতেই হোক্, যদি আমার পত্রের প্রতিটী বর্ণের অনুরূপ কাজ আপনি না করেন, তাহলে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে অর্থাৎ আপনি করবেন ইহলোক-লীলা সংবরণ এবং আপনার পথের যাত্রী হবে কয়েক সহস্র নিরীহ প্রাণী।

নিজের ভালমন্দ বিচার করবার শক্তি সকলেরই আছে, আপনারই বা না থাকবে কেন? সুতরাং সে বিষয়ে অনাবশ্যক কতগুলো কথা লিখে আপনার সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনি নিঃসংশয়ে জানবেন, আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। নমস্কার। —সাহেব পাণ্ডা

পত্রখানা পড়া শেষ হইতেই প্রতুল দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিয়া উঠিল, আস্ত একটা শয়তান!

কমিশনার প্রশ্ন করিলেন, এবার নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন ?

একটী বর্ণও না।

কিন্তু না-বোঝবার মত কিছু ত নেই এতে।

প্রতুলের চোখে ফুটিয়া উঠিল উগ্র একটা দীপ্তি ; কহিল, না-বোঝবার মত কিছুই নেই এতে !

কমিশনার দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, নিশ্চয়ই না। এর থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি, সাঙ্কো পাঞ্জা আমাদের সঙ্গে পরিহাস করেছে, এবং পরিহাস যদিই করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সে মুক্ত, অর্থাৎ আপনি চলে আসবার পরই সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সে সরে পড়েছে।

মাথাটা প্রবল বেগে আন্দোলন করিতে করিতে প্রতুল বলিয়া উঠিল, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কমিশনার এ কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না ; চিন্তাচ্ছন্ন মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রতুলও চিন্তাসাগরে ডুবিয়া গেল।

সাঙ্কো পাঞ্জার পলায়ন যে একেবারেই অসম্ভব—ইহাতে তার কোন সংশয়ই ছিল না। কিন্তু পত্রখানার প্রথম ভাগটা পড়িয়া মনে হয়, সে এখন মুক্ত।

বেশ, তাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শেষভাগের এ কথাগুলোর তাৎপর্য্যটা কি ? যদি সে মুক্তই হয়, তবে মুক্তিলাভের জন্য কেন তার এই ভীতি-প্রদর্শন ?

হঠাৎ একটা কথা প্রতুলের মনে জাগিতেই ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, চিঠিটার মানে আমি বুঝতে পেরেছি।

পেরেছেন ? কমিশনার সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন।

হ্যাঁ, পেরেছি। এ পত্রের লেখক সাঙ্কো পাঞ্জা নয়।

সাঙ্কো পাঞ্জা নয় ?

নিশ্চয়ই না। সাঙ্কো পাঞ্জা কখন অর্থহীন পত্র লিখতে পারে না।

এ ধারণাটা কিসে হল আপনার ?

সাঙ্কো পাঞ্জা লিখেছে,'যদি আমার পত্রের প্রতিটী বর্ণের অনুরূপ কাজ আপনি না করেন, তাহলে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে, অর্থাৎ আপনি করবেন ইহলোক-লীলা সংবরণ, আর আপনার পথের যাত্রী হবে কয়েক সহস্র নিরীহ প্রাণী।' এমন কোন অস্ত্রের নাম শুনেছেন আপনি, যার দ্বারা এক সঙ্গে কয়েক সহস্র লোককে একেবারে হত্যা করা যেতে পারে ?

কমিশনার কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দরজায় আঘাতের শব্দ শোনা গেল ; করাঘাত নয়, ক্রুদ্ধ পদাঘাত।

কমিশনার চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতুল গিয়া দরজা খুলিয় দিতেই দেখিল, মূর্ত্তিমান্ বিশু দাঁড়াইয়া।

দুই

বিশুকে দেখিয়া প্রতুল অবাক্ হইয়া গেল। যার হাতে সে বন্দী সাঙ্কো পাঞ্জার ভারার্পণ করিয়া নির্ভয়-নিশ্চিন্ত মনে পুলিস অফিসে সংবাদ দিতে আসিয়াছে, সে যে সাঙ্কো পাঞ্জাকে ছাড়িয়া এভাবে একলা এখানে চলিয়া আসিতে পারে, এ আশঙ্কা তার কল্পনায়ও স্থান পায় নাই।

প্রতুলকে দেখিতে পাইয়াই বিশু উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আচ্ছা লোককেই ত পাহারায় রেখেছেন কমিশনার সাহেব? শুধু কথা কাটা-কাটিই করবে, এক পা নড়ে খবরটা পর্য্যন্ত দিতে পারবে না! আশ্চর্য্য!

প্রতুল তাকে কমিশনারের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি বল ত?

বিশু চড়া সুরেই কহিল, তুমি কি শুনতে চাও, আগে তাই বল।

তুমি হঠাৎ এখানে এলে কেন?

প্রয়োজনটা তোমার কাছে; তুমি এখানে, কাজেই বাধ্য হয়ে আমাকেও আসতে হ'ল।

সাঙ্কো পাঞ্জা কোথায়?

জানি না।

তার মানে?

তার মানে আমি তোমাকে বলতে এসেছি তোমার কথা, সাঙ্কো পাঞ্জার কথা নয়।

আমার কথা বলতে চাও?

কমিশনার হতবুদ্ধি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিশু যে কি বলিতে চায়, এখানে আসিবারই বা তার উদ্দেশ্য কি—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

প্রতুলের কথায় বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, তোমার কথা এবং কথাটা হচ্ছে এই যে, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, দৃষ্টি শক্তি তোমার ক্ষীণ হয়ে এসেছে, গোয়েন্দাগিরির কাজে আর তোমার হাত দেওয়া চলে না এবং দেওয়া উচিতও নয়।

বিশু বলে কি! এমন কি ভুল করিয়াছে সে, যার জন্য আজ বিশু প্রকাশ্যে, তারই মুখের উপর দাঁড়াইয়া তার এতদিনকার অধিকৃত সম্মানের আসনটীকে অবহেলায় পদদলিত করিতেছে, এতটুকু দ্বিধা নাই, এতটুকু সঙ্কোচ নাই! বন্ধুত্বের মর্য্যাদা না হয় নাই রাখুক, অভিজ্ঞতার দিক দিয়া যে সম্মানটুকু তার প্রাপ্য, অন্ততঃ সেটাও ত তার বাঁচাইয়া চলা উচিত?

প্রতুলের দিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া বিশু কমিশনারের উদ্দেশে কহিল,এতদিন অবিশ্যি প্রতুল আপনাদের জন্যে অনেক খেটেছে, অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, অন্ততঃ তার খাতিরেও এ ভুলের জন্যে ওকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কি বলেন?

বিশুর কোন কথাটাই প্রতুল ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না; বলিল, আমার ভুলের জন্যে আমাকে ক্ষমা করা যেতে পারে? কি ভুল করেছি আমি? বক্তব্যটা তোর তাড়াতাড়ি শেষ কর্‌ বিশু...

বিশু কমিশনারের পানে তাকাইয়াছিল; তাঁর দিকে তাকাইয়াই বলিল, এর পরও যদি প্রতুল এরকম মারাত্মক ভুল করে, তাহলে হয়ত ক্ষমা নাও পেতে পারে, কি বলেন?

ধৈর্য্য রাখা প্রতুলের পক্ষেও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অস্বাভাবিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, মারাত্মক ভুল করেছি আমি?

বিশু কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল, নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার কথাটা এখন থাক্। কমিশনার সাহেবকে যা বলছি, সেইটাই আগে শেষ করি।

আসল কথাটা যে কি—জানিবার জন্য কমিশনারেরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, বলুন....

বিশু কেমন জানি একটা অস্বস্তির চিহ্ন মুখে ফুটাইয়া কহিল, কিন্তু ঠিক কোথেকে যে সুরু করব, বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আগে বলুন ত প্রতুল এতক্ষণ আপনাকে কি বলছিল?

কথাটা কোন রকমে বিশুর কর্ণগোচর হয়, এই রকমই মৃদু সুরে কমিশনার কহিলেন, প্রতুলবাবু বলছিলেন, সাঙ্কো পাঞ্জা বন্দী....

তাই নাকি! বিশুর কণ্ঠে বিস্ময়।

হ্যাঁ, এবং আপনি ও আনন্দমোহন পুলিশ-পাহারায় তাকে এখানে নিয়ে আসছেন।

বিশু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, ঠিক ওই ভয়টাই আমি করছিলাম...

তার মানে?

তার মানে আর কিছুক্ষণ আগে আমি যদি এখানে এসে পৌঁছোতাম, তাহলে আপনার কাছে কক্ষনো ওরকম গাঁজাখুড়ি গল্প করতে দিতাম না।

গাঁজাখুরি গল্প! বিদ্যুদ্বেগে বিশুর কাছে আসিয়া তার একখানা হাত সজোরে নাড়া দিয়া প্রতুল চীৎকার করিয়া উঠিল, গাঁজাখুরি গল্প!

বিশু অবিচলিত কণ্ঠেই জবাব দিল, নিশ্চয়ই! যা মিথ্যে তাকে যদি সত্যি বলে প্রচার করে বেড়াও, সেটা গাঁজাখুরি নয় ত কি?

প্রতুল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুই কি বলতে চাস সাঙ্কো পাঞ্জা বন্দী নয়?

নিশ্চয়ই না।

তাহলে নিশ্চয়ই সে তোর হাত থেকে পালিয়েছে?

বিশুকে তুই কি অত কাঁচা পেয়েছিস?

তবে?

তবে-টবে—এর ভেতর কিছু নেই। সব জলের মতই সোজা।

বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে প্রতুল বলিয়া উঠিল, তোর কাছে যেটা সোজা বলে মনে হচ্চে, অন্যের কাছে হয়ত সেটা সোজা নাও হতে পারে?

তার মানে সাঙ্কো পাঞ্জা তোমার আমার মতই মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন।

কিন্তু আমি যে তাকে স্বহস্তে বন্দী করে তোর আর আনন্দবাবুর হাতে দিয়ে এসেছি!

আনন্দবাবুর কোন হাত নেই, যা ঘটেছে, আমার জন্যেই।

কি করেছিস্ তুই?

তোকে ত বললুমই। সাঙ্কো পাঞ্জা আজ বন্দী নয়, এবং আমার হাত থেকে সে কখনো পালাতে পারে না। এর থেকে তুই যা বুঝতে পারিস…

বিশুর মনের তলে কোথায় কি আছে প্রতুলের দৃষ্টি যেন তাহাই খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর সহসা সে বলিয়া উঠিল, না, না, কক্ষনো তুই সে কাজ করিস নি, করতে পারিস্ নি।

কিন্তু আমি করেছি।

সাঙ্কো পাঞ্জাকে তুই মুক্ত করে দিয়েছিস্?

বিশু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, হ্যাঁ, অথবা....

অথবা?

না, না, আমিই তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

কিন্তু কেন? নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে এর ভেতর?

থাকাই ত স্বাভাবিক।

সেটা কি—আমি শুনতে চাই।

শুনতে তুই চাইতে পারিস, কিন্তু বলাটা আমার ইচ্ছে নয়।

কোন কথাই বলবি না?

আপাততঃ এইটুকু বলতে পারি, যখন দেখলুম সাঙ্কো পাঞ্জার সঙ্গে আমার মতের কোন গরমিলই নেই, তখন তার হাতে আমি আত্ম সমর্পণ করলুম....

শেষের দিকের কথাটা যেন শুনিতে পায় নাই, অথবা শুনিয়াও ঠিক বিশ্বাস করিতে পারে নাই, এইভাবে পতুল বলিয়া উঠিল, বিশু! তুই! তুই করলি সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে আত্ম সমর্পণ?

হ্যাঁ, আমি—সাঙ্কো পাঞ্জারই চিরশত্রু। সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে আত্ম-সমর্পণ করতেই সে আমাকে আদেশ দিলে গাড়ী জোরে চালিয়ে এদের কবল থেকে তাকে মুক্ত করতে। আদেশ তার অমান্য করলুম না, এমন জোরে গাড়ী চালালুম—কোথায় রইল পুলিশের লরী, আর কোথায় বা রইলেন আনন্দবাবু!....আনন্দবাবু অবিশ্যি দু'চারটে গুলি করেছিলেন, কিন্তু তখন আমরা বাতাসে উড়ছি, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

কমিশনার অপ্রসন্ন মুখে বলিয়া উঠিলেন, আপনার উক্তির গুরুত্বটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন, বিশুবাবু?

নিশ্চয়ই।

এবং এও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনার কাজগুলো কোনমতেই সমর্থন করা যেতে পারে না?

কিন্তু যখন করে ফেলেছি, তখন সমর্থন করা ছাড়া উপায় কি বলুন?

অথচ এর আগে আপনি এই সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দী করবার জন্যে কতবারই না জীবন বিপন্ন করেছেন!

বিশু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ আপনি বলতে চান, এবার তাকে বাঁচিয়ে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করে তুলেছি?

ঠিক তাই। কাজেই এটা বোঝা বোধ হয় আমাদের ভুল হবে না যে, বিশেষ কোন কারণেই এ কাজ করতে আপনি বাধ্য হয়েছেন?

বিশু সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা না করে আমি পারছি না।

প্রতুল গর্জ্জিয়া উঠিল, কিন্তু কোন্ অধিকারে তুমি...

বাধা দিয়া কমিশনার বলিয়া উঠিলেন, একটু থামুন প্রতুলবাবু, আমার কথাটাই আগে শেষ করতে দিন। বিশেষ কোন কারণেই আপনি তাহলে সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, কেমন?

বিশু জবাব দিল, কথাটাকে যদি আপনি ওইভাবে নেন, আমার কোন আপত্তি নেই।

বেশ। এখন আপনি এই চিঠিখানা পড়ুন, পড়ে যতটুকু বলতে পারেন, বলুন আমাদের।

বিশু তাড়াতাড়ি চিঠিখানার উপর চোখ বুলাইয়া লইল।

পড়া তার শেষ হইতেই প্রতুল প্রশ্ন করিল, কি বুঝলে এ থেকে?

বিশু গম্ভীর মুখে জবাব দিল, বুঝলুম, আমি যা করেছি, ঠিকই, তাতে একটু ভুল হয়নি।

যদি প্রমাণ চাই?

চাও, দোব, কিন্তু এখন নয়।

তুমি আমাদের অবস্থার গুরুত্বটা বুঝছ না বিশু!

বুঝেছি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি।

কি বুঝেছ, শুনতে চাই।

বিশু তার আসনটা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রতুলের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কমিশনারের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই একান্ত সহজ কণ্ঠে বলিতে সুরু করিল, 'আমি বুঝেছি, তুমি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ কর, আমি করি তোমাকে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি। আমি বুঝেছি, বিপদে-আপদে আমরা দু'জন দু'জনেরই ওপর নির্ভর করে চলি, যদি প্রয়োজন হয়, তোমার নিজের জীবন বিনিময়েও তুমি বিপদ থেকে রক্ষা করবে আমাকে, আর আমিও তোমাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্যে আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করব না। এই যদি আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ হয়, তাহলে আমার প্রত্যেকটী কথাই তুমি বুঝেছ, এবং বুঝে বিশ্বাসও করেছ।

বিশুর কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল এমন একটা ঐকান্তিকতা—যাকে উপেক্ষা ত করাই চলে না, মন প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। প্রতুল বুঝিল, বিশু যা করিয়াছে, একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞানেই করিয়াছে, এবং সে যদি তার

কৈফিয়ৎ দিতে রাজী না হয়, তাকে জেরা করা চলে না; সেখানে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি এবং আত্মসম্মানই তার কথার দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতুল তার দুই বলিষ্ঠ হাত দিয়া বিশুকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিল।

কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। তারপরই সে বিশুকে তার আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, এখন আয়,এ ব্যাপারের একটা মীমাংসা করে নেওয়া যাক। তোর কাজের কৈফিয়ৎ দিতে তুই রাজী নয়, কি বলিস?

বিশু দৃঢ়তার সহিত বলিল, না।

বন্দী সাঙ্কো পাঞ্জাকে তুই মুক্ত করে দিয়েছিস, একথা স্বীকার করছিস ত?

তা করছি।

এবং স্বীকার যখন করছিস্, তখন তার শাস্তিটার কথাটাও ভেবেছিস্ আশা করি?

তুমি আমাকে শাস্তি দিতে চাও?

নিশ্চয়ই। সাঙ্কো পাঞ্জার মুক্তির বিনিময়ে আমরা তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য। তুমি বন্দী।

তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই কমিশনার টেবিলের উপর হইতে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া বিশুর দিকে উদ্যত করিয়া বলিলেন, আত্ম-সমর্পণ করুন।

বিশু কৃত্রিম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আপনি কি আমাকে বলছেন?

কমিশনার বলিলেন, নিশ্চয়ই! সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আপনি আমাদের বন্দী।

বিশু ক্ষিপ্রপদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্চি, এ আদেশ আপনার মেনে নিতে পারলাম না কমিশনার সাহেব।

কমিশনার গর্জন করিয়া উঠিলেন, দাঁড়ান বিশুবাবু, আর এক পা এগিয়েছেন যদি, গুলি করতে আমি বাধ্য হব।

প্রতুল বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া আসিয়া কমিশনারের উদ্যত পিস্তলের সামনে দাঁড়াইয়া কহিল, বিশুকে গুলি করতে বাধ্যই যদি হন, আমাকে হত্যা না করে নয়।

বিশু এই অবসরে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল, ধন্যবাদ প্রতুল, ধন্যবাদ কমিশনার সাহেব!

কমিশনারের রোষ মুক্ত মুখের পানে তাকাইয়া প্রতুল পুনরায় কহিল, পালিয়ে যাবে কোথায়? আমি ওর জামিন হচ্চি। বিশেষ কারণেই ও যে সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দিয়েছে, এ কথা বুঝতে ত আর আপনার বাকী নেই?

কমিশনার ক্রোধ-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, এবং এও বুঝতে বাকী নেই যে, বিশুবাবু স্যাঙ্কো পাঞ্জারই অনুচর।

হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া প্রতুলের তরফে এ কথার কোন জবাব ছিল না; তাই সে মৌন হইয়া রহিল।

ঘরের ভিতর বিরাজ করিতে লাগিল উৎকট স্তব্ধতা।

কমিশনার তাঁর যুক্তি-তর্কের সমস্তটাই সাঙ্কো পাঞ্জার মুক্তির অনুকূলে মিলাইয়া লইতে গিয়া মনের মধ্যে বাধাই পাইতে লাগিলেন। প্রতুল কিন্তু নিঃসংশয়। বিশুর নির্দোষিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তার ছিল না।

কয়েক মিনিট স্তব্ধ থাকিয়া কমিশনার একসময় যেন জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য যে....

কিন্তু কথাটা তাঁর শেষ হইবার পূর্ব্বে সন্তর্পিত হস্তে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলেন আনন্দমোহন।

কমিশনারের অসমাপ্ত কথাটার সুর ধরিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, সাঙ্কো পাঞ্জার চক্রান্তে হয় বিশুবাবু মৃত...

আর না হয়? প্রতুল সাগ্রহে বলিয়া উঠিল।

আর না হয়, সাঙ্কো পাঞ্জার সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করে বিশুবাবুরই আগে ফাঁসির ব্যবস্থা করা উচিত।

তিন

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রতুল যখন কমিশনারের কক্ষ হইতে বাহির হইল, তখন তার মুখখানা বেদনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অনেক গুরুভারই সে নির্বিচারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, কিন্তু আজ তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে, জীবনে সে বোধ করি কোনদিন ইহার সম্ভাবনাও কল্পনা করে নাই। তার বন্ধু বিশু, তার ডান হাত বিশু, তার সোদরাধিক বিশু— সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আজ সেই বিশুকে গ্রেপ্তার করিবে কে? না প্রতুল!

কমিশনার মুখে বলিলেন, গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটায় সই করিয়া প্রতুলের হাতে দিলেন, প্রতুল গ্রহণ করিল, প্রতিবাদের একটা কথাও তার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

আনন্দমোহনের ইহাতে অবশ্য কোন দোষ ছিল না। বিশু যা করিয়াছে, তিনি তারই বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন, তার ভিতর না ছিল পক্ষপাতিত্ব, না ছিল অকারণ অনুযোগের উষ্মা। বিশু নিজমুখে যা স্বীকার করিয়াছে, আনন্দমোহন তারই পুনরুক্তি করিলেন মাত্র।

পথ চলিতে চলিতে প্রতুল ভাবিতে লাগিল, বিশুর নির্দোষিতা সপ্রমাণের অন্য কোন উপায় থাকিলে, কখনই সে পরোয়ানাটা হাতে লইত না, কমিশনার যতই বলুন। বিশুর ঘাড়ে যে ভূত চাপিয়াছে, তাকে নামাইতে হইলে, সবচেয়ে এইটারই বেশি প্রয়োজন। আর কিছু হোক,

আর না হোক্, সে অন্ততঃ কমিশনারের অকারণ সন্দেহের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল।

সে যেমন সকল সন্দেহের উর্দ্ধে, বিশুও যে তেমনি, ইহাতে তার কোন সংশয়ই ছিল না ; তবু মনে হয়...

মাথা নাড়িয়া হঠাৎ সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, এই মনে হওয়াটাই অন্যায়, অসঙ্গত। বিশু করবে সাঙ্কো পাঞ্জার সঙ্গে সন্ধি? অসম্ভব, অসম্ভব।

প্রতুল জানিত, এইরূপ পরস্পর-বিরোধী চিন্তাকে যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃই মনের নিভৃততম কোণেও শিকার চালাইয়া শক্ত হইয়া বসে ; তখন তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সুকঠিন। কাজেই সে জোর করিয়া এই সব চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজের মনের সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিল, অতঃপর তার কর্ত্তব্য কি?

কিন্তু এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর মিলিল না ; ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বকার চিন্তার মতই জটিল হইয়া উঠিল। অবশেষে সে ইহাই স্থির করিল, এ ক্ষেত্রে তার নিজের মতানুযায়ী কোন কাজ করা উচিত নয়! বিশুকে গ্রেপ্তারই করিবে।

কিন্তু সেখানেও একটা সমস্যা উঠিল। অন্যান্য অপরাধীদের বেলায় যেরূপ করা হয়, সেইভাবেই কি সে বিশুকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তার পিছন পিছন ঘুরিয়া বেড়াইবে? তা কি সম্ভব?

তাহলে কি করা উচিত? প্রতুল আবার তার মনকে জিজ্ঞাসা করিল।

এবার উত্তর মিলিল অতি সহজেই। বিশুর মূর্ত্তিটা তার মনে পড়িয়া

বুঝতেও পারনি কিছু ?

বুঝতে হয়ত পেরেছি, কিন্তু সে সন্দেহের কথা আমি প্রকাশ করতে পারব না।

না পার, থাক। কিন্তু আর সব কথা ?

হ্যাঁ, আর সবই বলছি। সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দী করে তুমি ত তাড়াতাড়ি চলে গেলে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্যে...

কি প্রচণ্ড আনন্দেই না উন্মত্ত হয়ে ছুটে গেছলুম....

আমার আনন্দটাই কি কম হয়েছিল ? চারদিকে সশস্ত্র পুলিশ-প্রহরী, আমি গাড়ীতে বসে, আর আমার পাশে বন্দী সাঙ্কো পাঞ্জা—হাতে পায়ে লোহার বলয় ! কত-না কথাই মনে জাগছিল ! দেশ আজ নিঃশত্রু, আর কিছু হোক্ আর নেই হোক্, অন্ততঃ আমরাও দিনকত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারব....উত্তেজনায় গাড়ীর গতি গেল বেড়ে। প্রতি মুহূর্তেই আমার মনে হতে লাগল, আমরা এগোচ্চি আমাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে আর সাঙ্কো পাঞ্জা এগোচ্চে তার ফাঁসিমঞ্চের দিকে....

তারপর ?

গাড়ী ছুটেছে উল্কাগতিতেই—হঠাৎ যেন মনে হল অস্ফুট গোঙানীর শব্দ ! অবাক্ হয়ে চাইলুম সাঙ্কো পাঞ্জার দিকে। মুখোসের ভেতর মুখখানা দেখা না গেলেও শুনতে পেলুম তার ভেতর যেন ঝড় বইছে ! মনে হল, এখুনি বুঝি বা দম বন্ধ হয়ে মারা যায় ! গাড়ীর গতিটা একটু কমিয়ে দিয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়লুম। শুনলুম সে বলছে, ওঃ ! এই মুখোস....এই মুখোস....

এই মুখোস....মানে ?

মানেটা তখন আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। তাকে বললুম, মুখোসটা যদি তোমার এতই কষ্টদায়ক হয়, তাহলে খুলে ফেললেই পার। পুলিস-অফিসে গিয়ে খুলতেই ত হবে। তার উত্তরে বন্দী কি বললে, জানো? বললে, না, আমি মুখোসও খুলব না, পুলিশ-অফিসেও যাব না। আমি জিগেস করলুম, কারণ? সে জবাব দিলে, কারণ তার আগেই তুমি আমার প্রাণরক্ষা করবে।

প্রতুল অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, তারপর?

তারপর সে তার লোহার বলয়-পরা হাত দুটো আমার চোখের সামনে একবার তুলে ধরল—বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম! একি! কার হাত এ!

কার হাত?

একটি তরুণীর।

তরুণীর!

প্রতুলের মুখের দীপ্তি যেন অকস্মাৎ নিভিয়া ছাই হইয়া গেল।

বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, হাঁ, একটি তরুণীর। মাথাটা আমার বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল! এত বড় একটা ভুল যে কি করে সম্ভব হতে পারে, আমি ভেবেই উঠতে পারলুম না!

প্রতুল নির্ব্বাক অচেতন মূর্ত্তির মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! জীবনে সে বোধ করি কখনও এত বড় সমস্যার সম্মুখীন হয় নাই! মানুষ ভুল করে, ইহা চির সত্য, কিন্তু তা বলিয়া এমন মারাত্মক ভুল! এর পর বাহিরের আলোয় তার মুখ দেখাইবার উপায় রহিল কি? সাঙ্কো পাঞ্জা চতুর, সাঙ্কো পাঞ্জা কৌশলী, ইহা তার অবিদিত নয়, কিন্তু সে যে তাকে

লইয়া শিশুর মতই খেলাইতে পারে, নাচাইতে পারে, ইহার সম্ভাবনা কোনদিনই তার মনে উদয় হয় নাই! বিশুর কাছেও তার মুখ তুলিয়া কথা বলিতে লজ্জাবোধ করিতে লাগিল!

শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে মানুষ যেমন প্রাণপণ বলে মুখখানা বাহিরের বাতাসে আনিবার চেষ্টা করে, প্রতুল ঠিক তেমনি করিয়া সজোরে মুখখানা উপরের দিকে তুলিয়া কহিল, তরুণীটি কি শোভনা সুনন্দা?

বিশু সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, তা আমি জানি না প্রতুল!

প্রতুল প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু উত্তরটা তার কানে পৌঁছিল না। চিন্তাধারা বন্যাস্রোতের মতই হু হু করিয়া ছুটিতেছিল। শোভনাকে যতটুকু সে জানে, এত বড় প্রতারণা করিবার মত মেয়ে সে নয়। সাঙ্কো পাঞ্জার ঔরসে যদিও তার জন্ম, তবু সে এখনও ফুলের মতই পবিত্র, স্বর্গের মতই নিষ্পাপ।

পকেটের ভিতর বিশুর গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা তার বুকে যেন কাঁটার মতই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। অপরাধী কে? সাঙ্কো পাঞ্জা ভ্রমে যাকে সে বন্দী করিয়াছিল, সে যদি সত্যই শোভনা সুনন্দা হয়, এবং বিশু যদি তাকে মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তার অপরাধ কোথায়?

প্রতুল বলিয়া উঠিল, না, না। সাঙ্কো পাঞ্জা ভ্রমে শোভনা সুনন্দাকেই যদি আমি বন্দী করে থাকি, তাহলে তাকে মুক্তি দিয়ে তুমি ভালই করেছ বিশু।

মনে জাগিল আবার একটা প্রশ্ন। সাঙ্কো পাঞ্জার কৃষ্ণাবরণ ও মুখোস

পরিয়া সুনন্দা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল কেন? উত্তর মিলিতেও বিলম্ব হইল না। সুনন্দা নিশ্চয়ই সেখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছিল সাঙ্কো পাঞ্জার কোন দুরভিসন্ধিতে বাধা দিতে অথবা তার কবল হইতে কোন নিরপরাধের প্রাণ রক্ষা করিতে।

বিশুকে সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, আর কোন কথা বলেছিল সে?

মুক্তির পূর্ব্বে সে আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিল।

চুক্তি!

হ্যাঁ। সাঙ্কো পাঞ্জা আবার কি একটা কাণ্ড বাধাতে বসেছে, তাতে বাধা দিতে সে চায় আমার সহায়তা।

কাণ্ডটা কি জান?

জানি, কিন্তু তার কাছে আমি শপথ করেছি, কাউকে বলব না।

না বল, ক্ষতি নেই, কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জার বিরুদ্ধে তোমরা যে অভিযান সুরু করবে, তাতে আমিও থাকব ত?

না! সাঙ্কো পাঞ্জার বিরুদ্ধে আমি তোমাকে কোনদিন কোনরকমেই সাহায্য করব না, এই আমার প্রতিশ্রুতি।

সুনন্দা কি চায় সাঙ্কো পাঞ্জাকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে?

সুনন্দা কি না বলব কি করে? আমি ত তোমাকে বার বার বলছি, সে কে আমি জানি না, চিনতে পারিনি।

চিনতে হয়ত তুমি পারনি, কিন্তু আমি পেরেছি।

বর্দ্ধিত বিস্ময়ে বিশু বলিয়া উঠিল, কে সে?

প্রতুল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, সে সুনন্দা না হয়ে যায় না।

বিশু চমকিয়া উঠিল ; কহিল, সে সুনন্দা ! শোভনা সুনন্দা ! সুনন্দা-কেই আমি মুক্তি দিয়েছি ?

প্রতুল গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিল, কিন্তু এটা তুমি নিঃসংশয়ে বলতে পার, সাঙ্কো পাঞ্জার নতুন কোন ফাঁদে আবার জড়াও নি ত ?

না বলেই ত মনে হয়।

তুমি কি সুনন্দার কাজটাকেই নিজের কর্ত্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছ ?

তা এক রকম নিয়েছি বৈকি।

কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কি জানো ?

তা জানি ! কমিশনারের আদেশ তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, কেমন, এই ত ?

আমার কর্ত্তব্য কি তাই নয় ?

আর আমারও কি কর্ত্তব্য নয়, তোমার হাত থেকে এই মুহূর্ত্তে মুক্তি-লাভের চেষ্টা করা ?

প্রতুল হাসিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাসিটা তার মিলাইয়াও গেল !

টেবিলের উপর চা-টা যে একেবারে জুড়াইয়া গেছে, বিশুর বুঝিতে বাকী ছিল না। তাই সে কহিল, চা-টাকে না হয় অনাদর করলে, কিন্তু চুরুটটাও কি....

প্রতুল আবার হাসিল ; হাসিয়া চুরুটটা হাতে তুলিয়া লইল !

দেশলাইটা দিল বিশু আগাইয়া। জ্বালাইবার সময় প্রতুলের মুখের ভাবটা তার দৃষ্টি এড়াইল না।

প্রতুল দ্বিধা না করিয়া সজোরে চুরুটটায় টান দিল—একবার, দুইবার তিনবার....এবং পর মুহূর্ত্তেই তার অবশ দেহটা চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল।

সযত্নে প্রতুলকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতে দিতে বিশু আপন মনেই বলিল, জানে এই চুরুটটার ভেতর আমার মুক্তি-লাভের উপায় আছে লুকোনো, তবু একটু দ্বিধা করলে না, সন্দেহ করলে না। একেই বলে বন্ধুত্ব! একেই বলে ভ্রাতৃত্ব!

অচৈতন্যের সমস্ত লক্ষণই প্রতুলের দেহে প্রকাশ পাইয়াছিল। তার দিকে চাহিয়া বিশু ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হয়ত নিজের মনকেই সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল, কতটুকুই বা! বেশিক্ষণ এ বিষের ক্রিয়া থাকে না, এখুনি সুস্থ হয়ে উঠবে। পালাবার পক্ষে আমার এইটুকু সময়ই যথেষ্ট।

দ্রুতপদেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দরজার সম্মুখে ভৃত্য কালীর সহিত দেখা। সে বলিয়া উঠিল, আবার কোথায় যাচ্ছেন ছোটবাবু? এখুনি আসবেন ত?

অন্যমনস্কের মতই বিশু উত্তর করিল, হ্যাঁ, আসব।

কিন্তু সত্যই কি সে আসিবে?

আসিবে—কিন্তু কবে? কতদিন পরে?

চার

ঘণ্টাখানেক....তারপরই প্রতুলের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

চেতনা ফিরিয়া পাইয়া কিন্তু সে চোখ মেলিল না বা উঠিবার কোন চেষ্টাই করিল না। সেই অবস্থায় শুইয়াই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করিল, এর পর কি করিবে সে? প্রশ্নটা কিছুক্ষণ ধরিয়া দুই কানের ভিতর বারে বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সঠিক কোন উত্তর পাইল না।

তখন সে সুরু করিল আগাগোড়া ঘটনাটা একবার আলোচনা করিয়া দেখিতে। সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচর সন্দেহে বিশুকে গ্রেপ্তার করিবার ভার কমিশনার তার উপর অর্পণ করিলেও, তিনি যে মনে মনে প্রতুলকেও সন্দেহ করিয়াছেন, ইহা তার অবিদিত ছিল না।....আশ্চর্য্য!

কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারই বা কি আছে? সাঙ্কো পাঞ্জা মাঝে মাঝে এমনই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, নিজেকেই নিজের সন্দেহ হয়। কমিশনার যখন শুনিবেন, বিশু ধরা পড়ে নাই, মুষ্টিগত হইয়াও হাত ফস্‌কাইয়া পলাইয়া গেছে, তখন যদি তিনি মনের সন্দেহ স্পষ্ট ভাষায় মুখে প্রকাশ করিয়া বলেন, প্রতুল কি বলিয়া তাঁর সে সন্দেহ মোচন করিবে?

একমাত্র উপায়—বিশুর পলায়ন-সংবাদটা তাঁকে না জানানো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কমিশনার যদি তার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে ত স্বচক্ষেই দেখিয়া গিয়াছে, বিশু এখানে আসিয়াছিল এবং নির্ব্বিবাধে পলায়নও করিয়াছে। সে না বলিলেও তাঁর ত কিছুই অজানা থাকিবে না? তাহা হইলে....

প্রতুল নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। নাঃ, ওসব চিন্তা আর সে করিবে না।

কিছু না বলিলেও ত চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। এক পথে বাধা পাইয়া সে তখন ভিন্ন ধারা অবলম্বন করিয়া ছুটিল। বিশু আবার কোন নূতন বিপদে ঝাঁপ দিল না ত?

সহসা তার কানে আসিল কার একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস!

নিঃশ্বাস যে ফেলিল, সে যে তার একান্ত সান্নিধ্যেই বসিয়া আছে, প্রতুলের বুঝিতে বাকী রহিল না।

কিন্তু আত্ম-সংবরণ করিবার শক্তি তার অসাধারণ, তাই সে কোনরূপ চঞ্চলতা দেখাইল না। পূর্ব্বের মত স্থির হইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কে সে হইতে পারে।

একবার চোখ মেলিয়া তাকাইলেই হয়ত সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়, কিন্তু তার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা আছে। সে যে চেতনা ফিরিয়া পাইয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রাণীটিকে জানিতে দিতে ইচ্ছুক নয়।

প্রথমে মনে হইল তার রমলার কথা। কিন্তু রমলা বাড়ীতে নাই, যেখানে সে গেছে, সেখান হইতে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসা সম্ভব নয়। তবে কি কালী?

কালীচরণের স্বভাব সে ভাল করিয়াই জানে। প্রতুলকে এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলে সে এতক্ষণ মহা হৈ চৈ সুরু করিয়া দিত। তাহা হইলে কি বিশু?

বিশুই বা দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? পলায়নের উদ্দেশ্যেই সে প্রতুলকে ঘুম পাড়াইয়াছে, দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি তার ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষা করিবে?

তা ছাড়া সে এমন করিয়াই বা নীরবে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে কেন? বন্ধুর এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া যদি সত্যই তার বুকে ব্যথা জাগে, সে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না, যে কোন উপায়েই হৌক্, তাকে জাগাইবার চেষ্টা করিবে। তবে কি ডাক্তার?

বিশু হয়ত চলিয়া যাইবার সময় ডাক্তারকে খবর দিয়া গেছে। কিন্তু ডাক্তারই বা এমনভাবে চুপ-চাপ করিয়া বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে কেন? তাহা হইলে বোধ করি কমিশনারের প্রেরিত কোন লোক।

কিন্তু তারা ত কেউ মুখ বুজাইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। প্রত্যেকেই এক একজন বক্তা। কথা কহিবার লোক খুঁজিয়া না পাইলে অন্ততঃ এতক্ষণ কালীকে লইয়াই বক্তৃতা জুড়িয়া দিত! তবে কে?

অগত্যা চোখ মেলিয়াই দেখিতে হইল।

হঠাৎ যেন পার্শ্ববর্তী প্রাণীটি বুঝিতে না পারে, এমনই ভাবে প্রতুল চোখের পাতা দুটি ঈষৎ উন্মীলিত করিল। আশ্চর্য্য! তার পাশে বসিয়া একটি নারী!

প্রতুল আর চোখ বুজাইতে পারিল না, নারীটিকে ভাল করিয়া দেখিবার, দেখিয়া চিনিবার আগ্রহ তার এতই প্রবল হইয়া উঠিল।

নারীটির সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ বসনে আবৃত, দৃষ্টি বাহিরের দিকে আবদ্ধ; কাজেই মুখখানা স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। তত্রাচ চিনিতে প্রতুলের বিলম্ব হইল না।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে। মনে মনে প্রতুল কোন নামই উচ্চারণ করিল না শুধু সাঙ্কো পাঞ্জার মুর্ত্তিটাই তার চোখের সম্মুখে বড় হইয়া ভাসিয়া উঠিল। এই নারীটিই কি তার সহধর্ম্মিণী নয়? এই নারীটাই প্রতি কাজে

তাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে না? অথচ কথায় সে এমনই ভাব দেখায়, যেন সাঙ্কো পাঞ্জার উপর তার কত বিদ্বেষ, কত ঘৃণা!

সুন্দরী সুজাতা আর শোভনা সুনন্দা—একজন সাঙ্কো পাঞ্জার সহধর্ম্মিণী, আর একজন তার স্নেহময়ী কন্যা। ঘটনা-চক্রে আজ বিশুর সহিত শোভনার দেখা হইয়াছে, সুজাতা বোধ করি আসিয়াছে তারই সহিত দেখা করিতে। কিন্তু কোথায় সে?

যেখানেই যে থাক, ব্যাপারটা যে ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে, প্রতুলের ইহাতে সংশয়ের লেশ ছিল না।

একবার তার মনে হইল, সুন্দরী সুজাতার যখন শুভাগমন হইয়াছে, সাঙ্কো পাঞ্জার আবির্ভাব হয়ত বিচিত্র নয়।

প্রতুল উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু একি! সর্ব্বাঙ্গ তার খাটের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, একটু নড়িবার-চড়িবারও উপায় নাই।

তবে কি বিশুই তাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে? মন বলিয়া উঠিল, না, না, এ কাজ সুজাতার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে চাহিয়া প্রতুল পরিহাসচ্ছলে বলিয়া উঠিল, আমি কি আপনাকে আমার সাদর অভিনন্দন জানাতে পারি, সুজাতা দেবী?

সুজাতা শিহরিয়া উঠিয়া প্রতুলের পানে ফিরিয়া তাকাইল।

কিন্তু প্রতুল ইহা লক্ষ্য করিল না; পূর্ব্ব কথারই সুর ধরিয়া বলিয়া চলিল, এবং তার সঙ্গে এটাও কি জানতে পারি, আমার এই বর্ত্তমান দুর-বস্থার কারণ...বলিতে বলিতেই সে সুজাতার মুখের পানে তাকাইয়া সহসা চকিত হইয়া উঠিল।

একি মুখ! কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। চোখে ভীত, ত্রস্ত দৃষ্টি...প্রতুলের মনে হইল, এখুনি বুঝি সে জ্ঞান হারাইয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িবে।

সুজাতা কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; তার মুখ, তার কণ্ঠ, তার দুই চোখ যেন কিসের অদৃশ্য আক্রমণে চাপিয়া আসিতে লাগিল।

প্রতুল পুনরায় প্রশ্ন করিল, আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন, সুজাতা দেবী?

সহসা প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া সুজাতা উত্তর করিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথার জবাব দিচ্চি। আমি—আমিই আপনার এই বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ....শেষের দিকে সুজাতার কথাগুলা চোখের জলে ভারী হইয়া জড়াইয়া গেল।

প্রতুল কিন্তু তেমনিই পরিহাসতরল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, সত্যি? এত বড় সৌভাগ্যের কারণটা আমি জানতে পারি কি?

আমাকে বিশ্বাস করুন প্রতুলবাবু, এর ভেতর প্রতারণাও নেই, বিদ্বেষও নেই, আপনি ত জানেন...

বাধা দিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, আমাকেও আপনি বিশ্বাস করুন সুজাতা দেবী, আমি কিছুই জানি না।

প্রবল বেগে, মাথাটা আন্দোলন করিতে করিতে সুজাতা কহিয়া উঠিল, না, না, আপনি জানেন। আপনি জানেন, কি যে যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি! আজ এখানে এসেছি...

তাকে শেষ করিতে না দিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, আজ এখানে

এসেছেন, আমাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখার জন্যে; কেমন, তাই নয়?

প্রতুলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুজাতা অবাক হইয়া গেল। গলার ভিতর কোথাও কোন রসের লেশমাত্র নাই, এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে কহিল, আপনি নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর প্রতুলবাবু! আজ যদি আপনার এখানে এসে থাকি, জানবেন বড় প্রয়োজনেই এসেছি, আর সত্যিই যদি আপনি আবদ্ধ হয়ে থাকেন, জানবেন....

কথাটা শেষ করিল তার প্রতুলই; বলিল, বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলেই আবদ্ধ হয়েছি। কেমন, নয়? কিন্তু বক্তব্যটা আপনার সাদা কথাতেই শেষ করলে ভাল হয় না, সুজাতা দেবী?

সুজাতা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, আপনাকে যদি না বাঁধতুম, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করতেন না কি?

সেটা আমি অস্বীকার করি না, সুজাতা দেবী!

তাহলে এই যে সাবধানতা অবলম্বন করেছি, তার জন্যে আপনি দোষ দিতে পারেন না?

দোষ দেওয়া দূরে থাক, আপনাকে আমি প্রশংসাই করছি। এখন বলুন দিকি, প্রয়োজনটা আপনার কি?

আমি এসেছি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে।

প্রতুল হাসিয়া উঠিল, ভিক্ষা! দস্যু-সম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জার সহধর্ম্মিণীকে ভিক্ষা দেওয়ার মত অবস্থা ত প্রতুল লাহিড়ীর নয়, সুজাতা দেবী।

সুজাতার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রতুল তা দেখিল, এবং ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধও হইয়া উঠিল।

মনে যাই থাক্, সুজাতা যে এখন ছলনা করিতেছে না, এ ধারণাটা হঠাৎ তার বদ্ধমূল হইয়া গেল। কহিল, বক্তব্যটা কি আপনার, বলুন সুজাতা দেবী। তার আগে শুধু আমি এইটুকু জানতে চাই, আপনি আমার বাড়ীতে ঢুকলেন কি করে?

দরজা খোলাই ছিল। বিশুবাবু গেলেন বেরিয়ে, তারপর কালীচরণও যেন কোথায় গেল....

তাহলে বহুক্ষণ ধরেই আপনি আমার বাড়ীর ওপর নজর রেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

যদি চাবি দেওয়া থাকত?

তাতেও বিশেষ অসুবিধা হত না। কারণ আপনার বাড়ীর চাবিও একটা আছে আমাদের কাছে।

আপনার কাছে?

ঠিক আমার কাছে নয়, তার কাছে।

'তার' মানে? গাঙ্কো পাঞ্জার কাছে?

হ্যাঁ। কিন্তু ও নামটা আমার সামনে দয়া করে আপনি উচ্চারণ করবেন না, শুনলে বুকের রক্ত আমার জমাট বেধে ওঠে!

কিন্তু যদি আমি জেগে থাকতুম? বিশু যদি আমায় ঘুম পাড়িয়ে না যেত?

বিশুবাবুকে নির্বিবাদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে আপনার জেগে থাকার সম্ভাবনাটা আমার মনেই উদয় হয়নি।

বিশুর ব্যাপারটা তাহলে আপনি জানেন?

জানি।

কিন্তু কি করিয়া যে জানিল, সে সম্বন্ধে প্রতুল কোন প্রশ্নই উত্থাপন করিল না। সে জানিত, পুলিশ-বিভাগের কোন গুপ্ত সংবাদই গাঙ্গো পাঞ্জার অবিদিত থাকে না।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, এবার আপনার বক্তব্যটা...

কিন্তু সে কথা ত আপনাকে আগেই বলেছি। আমি এসেছি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে।

কার জন্যে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

সুজাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তার জন্যে।

অসম্ভব! প্রতুলের কণ্ঠে উত্তেজনা।

সুজাতার চোখে আবার জল নামিয়া আসিল। সজল কণ্ঠে কহিল, কেন ?

কোনদিন—কোন রকমেই আমি গাঙ্গো পাঞ্জাকে ক্ষমা করতে পারি না।

ক্ষমা না করতে পারেন, মুক্তি দিতে পারেন ত ?

তাহলে আপনি জানেন, সে বন্দী ?

আমি জানি না, জানতে চাইও না। শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে চাই, ঘটনাটা যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই যেন তার শেষ হয়।

কথাটা আপনার ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বোঝাবুঝির কিছুই নেই এতে, বন্দীকে আর যেন ধরবার কোন চেষ্টাই করা না হয়।

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা ত বন্দী নয়, বন্দী সুনন্দা, এবং সুনন্দাকেও বিশু মুক্তি দিয়েছে।

মুক্তি যখন দিয়েছে, তখন পুনরায় তাকে বন্দী করতে চেষ্টা করবেন না যেন। তাহলে আগুন জ্বলে উঠবে—প্রতিহিংসার আগুন....

আগুনটা জ্বালাবে কে?

সে।

সে মানে সাঙ্কো পাঞ্জা? কিন্তু আপনি সাঙ্কো পাঞ্জার নাম উচ্চারণ করছেন না কেন?

আপনি জানেন না প্রতুলবাবু, ও নাম উচ্চারণ করলে দেহের প্রতিটী রক্তবিন্দু আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, আমার আমিত্বটুকু পর্য্যন্ত যায় ঘুচে....

আপনি কি মনে করেন সুজাতা দেবী, আমি কোনদিন তাকে বন্দী করতে পারব?

সুজাতা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। কহিল, হা ভগবান! একই কথা একই সময়ে কি করে আমি আপনার কাছে গোপনই বা করি, প্রকাশই বা করি? তবে শুনুন প্রতুলবাবু, আমি জানি বিশুকে আপনি ভাল-বাসেন, নিজের ভায়ের চেয়েও ভালবাসেন। তাকে সাবধান করে দিন, সে একটা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছে। বিপদে পড়লে তার জ্ঞান থাকে না, তাও আপনি জানেন, হয়ত এমন কিছু করে বসবে, যা আপনিও কোনদিন কল্পনা করতে পারেন না....

আপনার কথার একটা বর্ণও যে আমি বুঝতে পারছি না, সুজাতা দেবী? কোথা থেকে কোথায় চলেছেন আপনি?

মাপ করবেন, এর চেয়ে বেশি কিছু আর আমি বলতে পারব না।

যা বলতে চান, তাও অন্তত: স্পষ্ট করে বলুন !

প্রথমতঃ আমি বলতে চাই, বিশুবাবু যেন সব সময়েই সুনন্দার সঙ্গে থাকে।

কিন্তু সে সুযোগ যদি তার না হয় ?

তাহলে সে যেন কাউকে গ্রেপ্তার না করে।

প্রত্যেক কথাটাই আপনার দুর্ব্বোধ্য। বিশুর কথা থাক্ এখন, সুনন্দার কথাও থাক্, বলুন আমাকে কি করতে হবে ?

সুজাতা মুখ আনত করিয়া কহিল, যে কোন উপায়ে হোক্, বিশু বাবুকে আপনি গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করুন।

বিশুকে গ্রেপ্তার করব ?

হ্যাঁ। তাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে হলে ওই একটীমাত্র উপায়ই আছে।

কিন্তু বিশুকে আমি পাব কোথা ?

দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, ঘরে বসেই পাবেন। আপনার কাছেই আবার ফিরে আসবে সে।

মুহূর্ত্তের জন্য মৌন থাকিয়া প্রতুল কহিল, আপনার কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ত ?

সুজাতা ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না, মোটেই না। সন্দেহই যদি থাকবে, তাহলে এত কষ্ট করে আপনার কাছে আসব কেন ? আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রতুলবাবু, আমি যা বলছি, তার প্রত্যেকটী কথা কত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এর মধ্যে এমন কিছু নেই, যার

জন্যে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে,অথবা আপনার শক্তির একটী কণাও খরচ করতে হবে....তারপরই সহসা সে গলাটা অত্যন্ত খাটো করিয়া বলিল, আমি বিশুবাবুকে গ্রেপ্তার করতে বলছি কেন জানেন ? তাহলে সে আর অপর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।

সুজাতার আগমনের যথার্থ কারণ কি—তার এই এলোমেলো কৈফিয়তে প্রতুল সঠিক কিছু বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হয় না। সে আরও একটা কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, এমনি সময় সুজাতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি উঠছেন ?

হ্যাঁ, আর দেরী করতে পারি না, এবার যেতে হবে।

আমাকে মুক্ত না করেই ?

কিন্তু তাতে যে বাধা আছে প্রতুলবাবু !

বাধাটা কি ?

বিনা সর্ত্তে যদি আপনাকে মুক্ত করে দিই,তাহলে যে আপনি আমার অনুসরণ করবেন ?

তা হয়ত করব।

তাহলে মুক্তি দিই কি ক'রে ?

না পারেন, থাক। মনে করবেন না যেন, সর্ত্ত দিয়ে আমি মুক্তিক্রয় করব।

তাহলে মাপ করবেন, আমি চললুম...

কিন্তু যাবার আগে...না, থাক। ওটা হয়ত অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করবে।

কিন্তু আমি যদি আপনার কোন উপকারে আসি, তাহলে নিজেকে ভাগ্যবতী বলেই মনে করব।

দরকার ছিল একটা সিগারেট আর দেশালাই....কিন্তু আপনাকে বলা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ নয়?

ভদ্রতা-বিরুদ্ধ কিনা—সে কথা সুজাতার মাথায় মোটেই আসিল না। সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এই অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইয়া মানুষ কিরূপে সিগারেট টানিতে পারে?

সিগারেট-কেসটা টেবিলের উপরই পড়িয়াছিল। সুজাতা তার ভিতর হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া প্রতুলের মুখে দিল। তারপর দেশালাইটা জ্বালিয়া, হঠাৎ কি মনে হইতেই কহিয়া উঠিল, কিন্তু সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে আমার ত সাহস হচ্ছে না, প্রতুলবাবু!

প্রতুল হাসিয়া কহিল, কেন?

আমার মনে হচ্চে....

প্রতুল তারই কথার প্রতিধ্বনি করিল, মনে যা হচ্চে, ঠিক তাই। সিগারেটের আগুনে বাঁধনগুলো পুড়িয়ে আমি আপনার অনুসরণ করব।

সুজাতার হাতটা কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটাও। কহিল, তাহলে —তাহলে মাপ করবেন প্রতুলবাবু। আমি চললুম, নমস্কার....বলিয়াই সে জলন্ত দেশালাই-কাঠিটা ফু দিয়া নিভাইয়া মেঝের উপর ফেলিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাহিরে তার পায়ের শব্দ মিলাইয়া যাইতেই প্রতুল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, শুধু দেশলাইটাকেই কি আমার মুক্তির উপায় বলে ধরে নিলেন, সুজাতা দেবী? ভয় নেই, এই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার অনুসরণ করব...

পাঁচ

সিগারেটটা প্রতুল দুই ঠোঁটের মাঝে চাপিয়া ধরিয়াছিল এবং সেই-ভাবে ধরিয়াই দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তামাকের চূর্ণ পাতাগুলার ভিতর হইতে বাহির হইল ক্ষুদ্র একটা অস্ত্রের ফলক।

ফলকটার একটা প্রান্ত দাঁত দিয়া সবলে চাপিয়া ধরিয়া প্রতুল সর্ব্বাগ্রে হাতের বাঁধনটা কাটিবার জন্য অতি কষ্টে মাথাটা তুলিয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র হইলেও ফলকটার ধার বড় অল্প ছিল না; দড়ির উপর চাপ দিতেও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধা-ভিন্ন হইয়া গেল।

হাত দুটা মুক্ত করিয়া লইয়া দেহের অন্য স্থানের বাঁধনগুলা কাটিতে মুহূর্ত্তও তার বিলম্ব হইল না।

মুক্তি পাইয়াই প্রতুল ক্ষিপ্রপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। নিচে নামিবার সময় সহসা নজরে পড়িল, সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপে একটা নারী অবতরণ করিতেছে। তবে কি সুজাতা?

সুজাতা পরিয়াছিল কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ, এ নারীর অঙ্গে শুভ্র গরদের শাড়ী। সুতরাং ও মেয়েটী যে সুজাতা নয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

তবে কে ওই নারী? রমলার কোন বান্ধবী? তার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, ফিরিয়া যাইতেছে? কিংবা…

ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সুজাতা এতক্ষণ রাস্তায় গিয়া

পড়িয়াছে। আর কিয়ৎক্ষণ পরেই হয়ত সে দৃষ্টিপথের আড়ালে চলিয়া যাইবে। এক এক বারে সিড়ির দুই তিনটা ধাপ অতিক্রম করিয়া প্রতুল নিচে নামিতে লাগিল।

দ্বিতল হইতে নামিবার সময় হঠাৎ তার নজরে পড়িল ক্ষুদ্র একটা কাপড়ের পুটুলি—সিড়ির একান্তে পড়িয়া আছে। কৌতূহলভরে সেটাকে তুলিয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিতেই বাহির হইল সুজাতার কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ-গুলি! আসল ব্যাপারটা বুঝিতে প্রতুলের বিলম্ব হইল না। পাছে সে তার অনুসরণ করে, সেই সন্দেহে সুজাতা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তবে প্রতুলের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া প্রতুল পথের দিকে অগ্রসর হইল।

রাস্তায় পড়িয়া যখন সে কর্ম্ম-ব্যস্ত জনতার মাঝে মিশাইয়া চলিতে সুরু করিল, বুঝিবার উপায় ছিল না, সে কারও অনুসরণ করিতেছে!

অদূরেই সুজাতা··· চলিতে চলিতে হঠাৎ একসময় প্রতুলের মনে হইল এভাবে অধিকদূর অগ্রসর হওয়া আর মোটেই উচিত নয়; কারণ সুজাতা একবার যদি পিছন ফিরিয়া তাকায়,তাহা হইলে তার সমস্ত উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইবে।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উপায় নির্দ্ধারণ করিতেও প্রতুলের বিশেষ বিলম্ব হয় না। পথের উপর ফেরিওয়ালারা খবরের কাগজ বিক্রয় করিতেছিল; তাদেরই একজনের নিকট হইতে একখানা কিনিয়া লইয়া প্রতুল তার ভাঁজ খুলিয়া ফেলিল এবং কাগজখানার মাঝে অঙ্গুলি-পরিমাণ একটা ছিদ্র করিয়া লইয়া সেটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

যে পথে তারা আসিয়া পড়িয়াছিল, সেটা একটা অপরিসর গলি। পথটাও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সুজাতা এইখানে আসিয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইল।

কাগজের ছিদ্রটা দিয়া প্রতুল দেখিল, চোখের দৃষ্টি তার অনুসন্ধিৎসু। হয়ত কাহাকেও খুঁজিতেছে কিংবা কেহ অনুসরণ করিতেছে কিনা দেখিতেছে। কিন্তু সন্দেহ করিবার মত কিছুই ছিল না। পুনরায় সে নিজের মনেই পথ চলিতে সুরু করিল।

পথের ধারে আলোক-স্তম্ভটার নিকট দাঁড়াইয়াছিল একটি খঞ্জ ভিক্ষুক। প্রতুল তাকে অতিক্রম করিতে যাইতেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, কাণা খোঁড়াকে একটা পয়সা দাও বাবা।

প্রতুলের তখন সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। দ্রুতপদেই সে অগ্রসর হইতে লাগিল।

খঞ্জটি লাঠির উপর ভর দিয়া তার অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, একটা পয়সা দাও বাবা!....

প্রতুল বিরক্ত হইয়া তার দিকে তাকাইতেই খঞ্জটি খাটো গলায় বলিল, আমার দিকে ফিরে তাকাবেন না, প্রতুলবাবু! যেমন চলেছেন, তেমনি চলুন। চিনতে পারছেন না? আমি রজনী।

প্রতুল বিস্মিতের ভঙ্গীতে কহিয়া উঠিল, রজনী! কিন্তু তুমি এখানে করছ কি?

প্রতুলের দৃষ্টি ছিল সুজাতার দিকেই। রজনী তার সহিত সমান তালে চলিতে চলিতে জবাব দিল, আজ্ঞে, তেমন কিছু না...

কারও ওপর নজর রেখেছ?

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যর।

লোকটি কে জানতে পারি?

লোকটি মানে সত্যি কথা বলতে গেলে স্যর, তেমন কেউ নয়। মানে…

বুঝেছি! লোকটি বোধ হয় আমিই, নয়?

রজনী ঢোক গিলিয়া কহিল, সত্যি কথা বলতে গেলে স্যর….

প্রতুল বিরক্ত হইয়া কহিল, থাক্,সত্যি কথা বলার আর দরকার হবে না। কিন্তু একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, রজনী, আদেশটা কার? আনন্দবাবুর না কমিশনার সাহেবের?

আজ্ঞে, স্যর, বলতে গেলে দুজনেরই।

কোন পরোয়ানা আছে নাকি?

আজ্ঞে না, সে রকম কিছু নেই। শুধু অনুসরণ করবারই আদেশ হয়েছে।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

আপনার বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে স্যর,'খোঁড়া নাচার বাবা'করছিলুম। তারপর আপনি বেরুতেই পিছু নিয়েছি।

বেশ, তাহলে পিছুই নাও।

কিন্তু আপনি কি রাগ করলেন, স্যার? আপনাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে কিনা….

ব্যস্ততাটা কি রাগের লক্ষণ নাকি?

অস্বীকার করলে চলবে না স্যর, আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি আপনি ওই মহিলাটির অনুসরণ করছেন?

যদি তাই করি, কিছু বলবার আছে কি তোমার ?

রজনী জিভ কাটিয়া বলিল, না, না, স্যর, আপনাকে বলবার এত আমার কি থাকতে পারে ? তবে কি বলছি জানেন স্যর, যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয়, তাহলে আমি এখখুনি করতে রাজী।

কি উপকারটা তুমি করতে চাও ?

মানে সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থেকে...

তার কথার ভাবে প্রতুল না হাসিয়া পারিল না। কহিল, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাও, না কমিশনারের আদেশ, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমাকে চোখের আড়াল ক'র না ?

হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়া অপ্রতিভ লজ্জায় রজনীর মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। আমতা আমতা করিয়া কহিল, মানে আপনি যদি ইচ্ছে করে আমাকে সঙ্গে না রাখেন স্যর, তাহলে আমার সাধ্য কি যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকি ?

বেশ, আমি কথা দিচ্চি, তোমাকে না বলে কোথাও যাব না। বিশেষ প্রয়োজনে যদি যেতেই হয়, তাহলে এই রাস্তাটার মোড়ে অপেক্ষা কর, আমি যথাসময়েই তোমার সঙ্গে এসে মিলব।

ধরুন, আমাকে যদি আপনার দরকারই হয়, স্যর ?

সঙ্কেত করব।

রজনী দ্রুত অগ্রসর হইয়া সুজাতার প্রায় কাছাকাছি উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতুল পূর্ব্বের ব্যবধান বজায় রাখিয়াই ধীর মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল।

সোজা পথটায় আর না চলিয়া সুজাতা হঠাৎ ডান দিকের রাস্তা

ধরিল। রজনী তার লাঠির উপর ভর দিয়া ঠিক তেমনিভাবেই চলিয়াছে —ঠক্, ঠক্, ঠক্।

যদিও. দুশ্চিন্তার কোন কারণই ছিল না প্রতুলের, তত্রাচ সে তাড়াতাড়ি সেই পথটুকু অতিক্রম করিয়া মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কোথায় সুজাতা? কোথায় রজনী? যতদূর দৃষ্টি যায়, দু'জনের কেহই প্রতুলের লক্ষ্যগোচর হইল না।

কি যে ঘটিতে পারে, প্রতুলের ধারণায় আসিল না। চোখে ধুলি দিয়া পলায়ন সুজাতার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু রজনী? সেও সুজাতার সঙ্গে অদৃশ্য হইল কোথায়? প্রতুলের দ্রুতপদে গলিটার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বেশীদূর সে যায় নাই, হঠাৎ তার নজরে পড়িল, রজনীর সেই কৃত্রিম খঞ্জপদের অবলম্বন-যষ্টি দুটি পথের উপর লুটাইতেছে। সমস্যাটার মীমাংসা হইল না, তবুও প্রতুল এই ভাবিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল যে, সুজাতার দ্রুত অনুসরণ করিতে গিয়া রজনীকে যষ্টি দুটির মায়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে।

প্রতুলের আর অগ্রসর হওয়া চলে না। নির্দ্দিষ্ট পথের মোড়টায় দাঁড়াইয়া রজনীর অপেক্ষা করাই উচিত। সুতরাং সে ফিরিয়াই চলিল।

মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এই সময় পিছন দিক হইতে একটা ট্যাক্সি ছুটিয়া আসিয়া কঁ্যাচ করিয়া তার পাশে থামিয়া পড়িল।

প্রতুল সকৌতুকে চাহিয়া দেখিল, ট্যাক্সির আরোহী রজনী।

তাকে দেখিয়াই রজনী জানালার ভিতর দিয়া মুখ গলাইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, আসুন, আসুন স্যর, শীগগির উঠে আসুন...

ট্যাক্সিতে উঠলে যে হঠাৎ! প্রতুলের কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল অসহ্য বিস্ময়ের সুর।

রজনী খুসীমুখেই জবাব দিল, আজ্ঞে, আমার সবল পা দুটো ফিরে পেয়ে বড়ই আনন্দ অনুভব করছি।

সুজাতা কোথায়?

গাড়ীতে উঠে আসুন না স্যর, সব বলছি! তাঁর সন্ধান না নিয়ে কি আর এমনি ট্যাক্সিতে চেপে বসেছি?

কোথায় সে? শীগগির বল!

তবে শুনুন স্যর। অনেক দিন আগে আপনি আমাকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিছলেন, আমি সেটা এখনো ভুলিনি।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রতুল বলিয়া উঠিল, বক্তৃতা রাখ এখন....

আজ্ঞে, বক্তৃতা ত নয়। সেই কৌশল-বলেই ত আমি জানতে পেরেছি সুজাতা দেবী যাচ্ছেন কোথায়। যখন দেখলুম যে, তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছে এমন একটা গাড়ীতে তিনি উঠতে যাচ্ছেন...

তার জন্যে গাড়ী অপেক্ষা করছিল? মোটর না ট্যাক্সি?

ট্যাক্সি স্যর, এই দেখুন না নম্বরটাও তার টুকে এনেছি।

তারপর?

তারপর আর কি! গাড়ীটার দিকে এগিয়ে গিয়ে আমি তার দরজাটা খুলে দিলুম...

গাড়ীটার ভেতর আর কেউ ছিল?

আজ্ঞে না, জনপ্রাণী না। দরজাটা খুলে দিয়েই আমি বললুম, ভেতরে উঠুন। ড্রাইভারকে কোথায় যেতে বলব বলুন ত?

প্রতুল হাসিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি উত্তর পেলে সুজাতা দেবীর কাছ থেকে ?

রজনী মহা-উৎসাহে কহিল, তিনি বললেন, কোথায় যেতে হবে, ড্রাইভার জানে।

কিন্তু....

দাঁড়ান, দাঁড়ান, স্যর, আগে আমার কথাটাই শেষ করেনি। এই এই পর্য্যন্ত গেল আপনার কৌশল। তারপর বিশুবাবুর কাছ থেকে যে কৌশলটা শিখেছিলুম, তাও দিলুম কাজে লাগিয়ে। সুজাতা দেবী গাড়ীর ভেতর উঠে বসতেই দরজাটা সজোরে বন্ধ করতে করতে ড্রাইভারকে জিগেস করলুম, কি হে স্যাঙাৎ ! কাঁহা জানে হোগা জানো ত ? সে হেসে জবাব দিলে, হাঁ, হাঁ, জানতা হ্যায় বৈকি, বালি পুলকা বিচ মে। দরজা বন্ধের শব্দে আমাদের কথাগুলো সুজাতা দেবীর কানেই ঢুকল না। ব্যস্ —কেল্লা মার দিয়া।

রজনীর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া প্রতুল খুশী হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না। তার চিন্তাধারা তখন ভিন্ন পথ ধরিয়া ছুটিয়াছিল ! সুজাতার উদ্দেশ্য কি ? এত রাত্রে বালি ব্রিজের মাঝখানেই বা তার কি প্রয়োজন ? কার সহিত সে দেখা করিতে চায় ? কে সে ? সাঙ্কো পাঞ্জা ?

গাড়ীটা পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছিল ! কারও মুখে কথা নাই। হঠাৎ প্রতুল এক সময় যেন সজাগ হইয়া প্রশ্ন করিল, গাড়ীটা যাচ্ছে কোথায় ?

রজনী বিস্ময়ের সুরে কহিল, কেন, বালি ব্রিজে। ওখানেই ত আমাদের যেতে হবে, পুলটার ওপর নজর রাখতে হবে ?

কিন্তু...

এর ভেতরেও 'কিন্তু' আছে স্যর।

আছে বৈকি। প্রথম থেকেই আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

এর আর সাবধানতা অবলম্বন কি? যাব, সুজাতা দেবী যেমনি পুলের মাঝখানে গাড়ী থেকে নামবেন, অমনি খপ্ করে ধরব....বলিয়াই সে প্রতুলের হাতটি খপ্ করিয়া ধরিতে গিয়া তখনই সামলাইয়া লইল।

প্রতুল অন্যমনস্কের মতই কহিল, পুলের দুধারে দুটো রাস্তা আছে, না?

তা ত আছেই, স্যর। একটা দিয়ে লোক যায়, আর একটা দিয়ে আসে।

ওদুটো পথেই আমাদের কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে।

পাহারার বন্দোবস্ত? এত রাতে আবার পাহারাওলা খুঁজতে যাব কোথায়, স্যর?

পাহারাওলার দরকার নেই, পাহারা দোব আমরা নিজেই। তুমি থাকবে বাঁ-দিকের রাস্তাটায়, আমি থাকব ডান দিকে। তাহলেই সুজাতা দেবী গাড়ী থেকে নেমে যেদিকেই যাক না কেন, আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারবে না।

আপনি তাঁকে গ্রেপ্তারই করতে চান ত?

ঠিক গ্রেপ্তারই যে করব, তার কোন মানে নেই। সেটা নির্ভর করছে পরবর্ত্তী ঘটনার ওপর। আমরা এবার দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়লুম, না? এবার তুমি নেমে পড় গাড়ী থেকে, এখান থেকেই আমরা আলাদা যেতে চাই।

আমি কি হেঁটেই যাব, স্যার।

না, না, হেঁটে যাবার সময় মোটেই নেই! চট্ করে একটা ট্যাক্সি ডেকে নাও। পুলের এধারে নেমে বাঁ-দিকের রাস্তাটায় থেকো।

আমি কি ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা করব, স্যার।

না, না, মোটেই না। বরং তুমি ওখানে নির্বিঘ্নে পৌঁছেই আমাকে সঙ্কেত করবে—পর পর তিনটে দেশলাই কাঠি জ্বেলে। আমায় যদি প্রয়োজন হয়, আমিও তোমাকে সঙ্কেত করব। যদি একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালি, বুঝবে আমি তোমায় ডাকছি, ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হবে। যদি দুটো কাঠি জ্বালি, তাহলে যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আর তিনটে কাঠি পর পর জ্বাললে তখুনি তুমি আমার সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবে, জেনো গোলমাল হয়েছে কিছু। বুঝেছ?

রজনী একগাল হাসিয়া জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার! এমন সহজ কথা আর বুঝতে পারব না?

চলন্ত একটা ট্যাক্সিতে রজনী উঠিয়া পড়িল। কিন্তু হঠাৎ আবার কি একটা মনে পড়িয়া যাইতেই গাড়ীটা থামাইয়া কহিল, আচ্ছা, মনে করুন স্যার, এমন যদি কোন কারণ ঘটে যাতে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি, তাহলে...

তাহলে পুলটার মুখে এসে দাঁড়িয়ে থেকো, ঠিক সময়েই আমার দেখা পাবে। এখনও কি তোমার সন্দেহ হচ্ছে....

তাকে শেষ করিতে না দিয়া রজনী প্রবলবেগে মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, না স্যর, না স্যর, আপনাকে আবার সন্দেহ?

গাড়ী চলিয়া গেল।

প্রতুল ভাবিতে লাগিল, এই যে মায়ামৃগের মতই সুজাতা তাদের ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছে এবং তারাও নির্কোধের মত তার অনুসরণ করিতেছে, ইহার ভিতর সাঙ্কো পাঞ্জার কোন অভিসন্ধি আছে কিনা—কে জানে!

গাড়ী পুলের মুখে আসিয়া থামিতেই প্রতুল তার নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিল। পর পর তিনটা দেশালাই-কাঠি জ্বালিয়া রজনীও জানাইয়া দিল, নির্ব্বিঘ্নেই পৌঁছিয়াছে সে।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিবার পরই পুলের মাঝখানে একটা গাড়ী আসিয়া থামিল।

ছয়

প্রতুলের মনে আনন্দ যতখানিই হোক, দুর্ভাবনারও অন্ত ছিল না। এত সহজে ধরা দিবার পাত্রী সুজাতা নয়, সাকো পাঞ্জা ত নয়ই।

নম্বরটা দেখিয়া প্রতুলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, গাড়ীখানির আরোহিণী সুজাতা।

ড্রাইভার নামিয়া আসিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতেই গাড়ী হইতে যে অবতরণ করিল, তাকে দেখিয়া প্রতুল অবাক হইয়া গেল। এ ত সুজাতা নয়, অপরিচিত একটি পুরুষ।

প্রতুল ভাবিল, পথেই হয়ত কোথাও এ লোকটী গাড়ীতে উঠিয়াছিল, সুজাতা এখনো ভিতরেই আছে, এখনি নামিবে।

কিন্তু হায়রে! প্রত্যেকটী ঘটনাই আজ প্রতুলের কল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। লোকটি পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া ড্রাইভারের প্রাপ্য চুকাইয়া দিতেই গাড়ীখানা দ্রুতগতিতে চলিতে আরম্ভ করিল। কোথায় সুজাতা? গাড়ী হইতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নামিল না। তবে কি সুজাতাই তাদের চোখে ধুলি দিবার জন্য পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে? কিন্তু তাও সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। গাড়ীতে উঠিয়া সুজাতা যদি বেশ পরিবর্ত্তন করিত, তাহা হইলে ড্রাইভার নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করিত। তার কথায় বা ভাবে তেমন কিছুই বোধ হইল না।

নূতন আর একটা কথা প্রতুলের মনে আসিয়া উদিত হইল। হয়ত সুজাতা ইতিপূর্ব্বেই গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়াছে, তার পরিবর্ত্তে গাড়ীটা

ভাড়া লইয়াছে অপর একজন ; সে-ই আসিয়া এখানে অবতরণ করিল। কিন্তু তাই-বা কি করিয়া সম্ভব ? সুজাতার মত ইহারই বা পুলটার মধ্যস্থলে নামিবার কি প্রয়োজন ? সমস্তটাই যেন একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকায় ভরা।

লোকটি পকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল, প্রতুল চাহিয়া রহিল, তারপর সে ধীরে ধীরে বাঁ-দিকের রাস্তাটা ধরিয়া চলিতে সুরু করিল, প্রতুল চাহিয়া রহিল। লোকটির পশ্চাদনুসরণ করিবার কোন আগ্রহই তার দেখা গেল না। ও-রাস্তায় আছে রজনী, তার চোখকে ফাকি দিয়া সে যে পলাইতে পারিবে না, এ বিশ্বাস প্রতুলের ছিল। সে একই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল ঘটনার ক্রমবিকাশের অপেক্ষায় !

কিন্তু বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করিতে হইল না, হঠাৎ প্রতুলের নজরে পড়িল, যে পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে, সেই পথটি ধরিয়াই একটি নারী ধীরপদে অগ্রসর হইতেছে। নারীটি যে সুজাতা—প্রতুলের চিনিতে বিলম্ব হইল না।

সুজাতার দৃষ্টি পথের উপর নিবদ্ধ ছিল না, লোকটির অনুসন্ধানেই বোধ করি চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল।

প্রতুলের ধারণা হইল, নিশ্চয়ই ইহাদের দু'জনের কথা ছিল এইখানে সাক্ষাৎ করিবার। পথে এই লোকটির সহিত দেখা হইতেই সুজাতা ইহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছে, এবং পাছে কেহ তার অনুসরণ করে এই সন্দেহে আগেই গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে আসিতেছে। কিন্তু কি

প্রয়োজন তাদের—এই গভীর রাত্রে এমন নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মিলিবার ?

হঠাৎ একটা কথা প্রতুলের মাথার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ-বিকাশের মত খেলিয়া গেল। কে এই লোকটি ? সাঙ্কো পাঞ্জা নয় ত ?

নিশ্চয়ই সাঙ্কো পাঞ্জা। প্রতুল আপন মনেই কহিয়া উঠিল, এতক্ষণ এ কথাটা ত বোঝাই উচিত ছিল। সাঙ্কো পাঞ্জারই আদেশে সুজাতা এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে, সাঙ্কো পাঞ্জারই আদেশে সে অনুরোধ করেছিল বিশুকে গ্রেপ্তার করতে। বিশু না জেনে সুনন্দাকে মুক্তি দিয়েছে, আবার যদি গ্রেপ্তার করে ? সুনন্দা সাঙ্কো পাঞ্জারই অতি আদরের মেয়ে—সে চেষ্টা করবে না তাকে নিরাপদে রাখতে ?

লোকটি তখন বাঁদিকের রাস্তাটা ছাড়িয়া গাড়ী হইতে যেখানে নামিয়াছিল, সেখানেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দৃষ্টি তার সুজাতার দিকে।

প্রতুল লক্ষ্য করিল, পকেট হইতে রুমালটা বাহির করিয়া সে একবার মুখের উপর বুলাইয়া লইল। সন্দেহের চোখে দেখিলে সেটাতে সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই মনে করা চলে না।

সাঙ্কো পাঞ্জা যে এবার কিছুতেই তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা সে মনে মনে একরূপ স্থির করিয়াই লইয়াছিল। যত বড় বিপদই সম্মুখীন হোক, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়াও সে সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দী করিবে। চরম প্রয়োজনের ক্ষণে রজনীর সাহায্য পাইবার আশা তার দুরাশা নয়।

পকেটের ভিতর হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া প্রতুল দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিল।

সুজাতা ততক্ষণে লোকটি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ইহাদের মিলনে বাধা দেওয়া প্রতুল সমীচীন বোধ করিল না। করুক না দু'জনে কি পরামর্শ করিতে চায়। তারপর সুযোগ বুঝিয়া এক সময় সাঙ্গো পাঙ্গার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেই চলিবে।

গ্যাসের আলোকে যতটুকু দেখা যায়, সুজাতার মুখে উদ্বেগের কোন চিহ্নই নাই। সে ঘুণাগ্রেও বুঝিতে পারে নাই যে, কেহ তার অনুসরণ করিয়াছে।

লোকটির সম্মুখীন হইয়াও সুজাতা দাঁড়াইল না, ডানদিকের ফুটপাথ ধরিয়া সোজাই অগ্রসর হইতে লাগিল। এইবার দেখা গেল লোকটিকে তার অনুসরণ করিতে।

প্রতুল বুঝিল এই উপযুক্ত অবসর। গ্যাস-পোষ্টের আড়ালে দাঁড়াইয়া সে উপর্যুপরি তিনটি দেশলাই-কাঠি জ্বালিল।

কিন্তু কোথায় রজনী? তার যে কোন উদ্দেশই নাই! তবে কি সে কাঠির আলো দেখিতে পাইল না?

আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হইয়া সুজাতা দাঁড়াইল, লোকটিও তার পাশে আসিয়া কথা বলিতে সুরু করিল।

বোধ করি কোন অনুরোধ কিংবা উপদেশ—লোকটি হঠাৎ সুজাতার হাত দুটো ধরিয়া ফেলিল। তাদের কথাবার্ত্তার একটি বর্ণও কিন্তু প্রতুলের কানে পৌঁছিল না।

কথা কহিতে কহিতে তারা আরও দূরে চলিয়া গেল। প্রতুলের দুশ্চিন্তার কোন কারণই ছিল না, কারণ ওই পথেই রজনী দাঁড়াইয়া আছে, দেখিতে পাইলে সে নিশ্চয়ই ইহাদের বাধা দিবে।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই লোকটি সম্মুখের পথে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাদ্দিকে ফিরিল। এবার তারা আসিতেছে প্রতুলের দিকেই। তবে কি সে রজনীকে দেখিতে পাইয়াছে? সঙ্গে সঙ্গে লোকটি তার মুখের ভিতর দুটা আঙুল ভরাইয়া দিয়া বিকট একটা শিস দিয়া উঠিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা এবার যে তার অনুচরদের সঙ্কেত করিতেছে, প্রতুলের সন্দেহ রহিল না; সুতরাং আর দেরী করা চলে না। দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তলটা ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

শীতের রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছিল। সাঙ্কো পাঞ্জাকে আর ভাল করিয়া দেখা যায় না। প্রতুলের চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল শুধু দুটি ছায়ামূর্ত্তি।

সাঙ্কো পাঞ্জা যে আজ কোনরূপেই পলাইতে পারিবে না—এ ধারণা প্রতুলের বদ্ধমূল হইয়াছিল। হয় তার হাতে, নয় রজনীর হাতে সে ধরা প [illegible]।

আরও কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া গভীর উত্তেজনায় সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আত্ম-সমর্পণ কর সাঙ্কো পাঞ্জা! হাত দুটো ওপর দিকে তোল, নৈলে বাধ্য হয়েই আমায় গুলি করতে হবে।

প্রতুলের কথার উত্তরেই যেন উত্তরের কনকনে বাতাস খানিকটা হু হু করিয়া বহিয়া গেল।

অঙ্গুলিটা পিস্তলের ঘোড়ার উপর রাখিয়া প্রতুল পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল, হাত দুটো তোল ওপর দিকে....

ওধার হইতে রজনী আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,

আর ভয় নেই স্যর, আমি যাচ্ছি এদিক থেকে, আপনি আসুন ওদিক থেকে, মাঝে ফেলে ওকে পিষে মেরে ফেলি।

কুয়াশার ভিতর দিয়া সাঙ্কো পাঞ্জাকে আর দেখা যাইতেছিল না। প্রতুল রজনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তুমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো রজনী। স্বেচ্ছায় ধরা না দেয়, গুলি করতে দ্বিধা ক'র না।

প্রতুল দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল, রজনীও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বিপরীত দিক হইতে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতে লাগিল শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে।

উভয়েই পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। মাঝে হয়ত হাত কয়েক ব্যবধান। কিন্তু কোথায় সাঙ্কো পাঞ্জা? কোথায় সুজাতা?

রজনী হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, আপনি তাদের ঠিক দেখতে পেয়েছিলেন স্যর?

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও তাদের ঠিক দেখতে পেয়েছিলে ত?

রজনী প্রশ্ন করিল, আপনার পাশ দিয়ে তারা পালায় নি ত?

প্রতুলও প্রশ্ন করিল, তোমার পাশ দিয়ে তারা পালায় নি ত?

রজনী দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল,আমার পাশ দিয়ে তারা কক্ষনো পালাতে পারে না।

প্রতুল কহিল, আমার পাশ দিয়েও যে তারা পালায় নি, এটা ধ্রুব-সত্য।

ব্যর্থতার উষ্ণ শোণিত রজনীর ভিতরে তখনও বোধ করি টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছিল; তাই সে উত্তেজিত কণ্ঠে পুনরায় কহিল, আমার পাশ দিয়ে পালাতে দেখলে আমি কি অমনি ছেড়ে দিতুম, স্যর? দিতুম না গুলির ঘায়ে পা দুটো খোঁড়া করে?

প্রতুল আর কথা কহিল না; গুম্ হইয়া রহিল। এদের দু'জনের মাঝখান হইতে সুজাতা ও সাঙ্কো পাঞ্জার অন্তর্দ্ধান সম্ভব হইল কিরূপে?

প্রতুলের সে গম্ভীর মুখের সামনে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলার সামর্থ্য আর যারই থাক্, রজনীর ছিল না। নির্ব্বোধের মত সেও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে প্রতুলই কহিল, প্রথম ওরা যাচ্ছিল ডানদিকের ফুটপাথ ধরে....

রজনী বলিয়া উঠিল, তারপর কিন্তু বাঁদিকের ফুটপাথে আসে।

বাঁদিকের ফুটপাথে যখন যায়, তখন আমি রাস্তার মাঝখানে।

আমিও ঠিক তাই, স্যর!

দুদিকের ফুটপাথে আমি কিন্তু সমান ভাবে নজর রেখেছিলাম।

আমিও একবার এদিকে চাই, একবার ওদিকে চাই আর ছুটি।

তাহলে তারা গেল কোথায়?

ভোজবাজি স্যর, ভোজবাজি। আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, সাঙ্কো পাঞ্জা ভোজবাজি জানে।

প্রতুল চিন্তাভরা কণ্ঠে কহিল, ভোজবাজির বলে আকাশে ত উড়ে যেতে পারে না?

রজনী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আর জলেও ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে না?

কথাটা প্রতুলকে আঘাত করিল। ক্ষণেক মৌন থাকিয়া কহিল, জলে ঝাঁপ দেওয়া! কেন, তা ত অসম্ভব নয়?

আপনি কি বলতে চান স্যর, সাঙ্কো পাঞ্জা সুজাতা দেবীকে নিয়ে আত্মহত্যা করবে?

চিন্তিত মুখেই প্রতুল বলিয়া উঠিল, কেন, আত্মহত্যা করবে কেন?

গঙ্গার দিকে হাতটা বাড়াইয়া রজনী জবাব দিল, একবার জলের দিকে চেয়ে দেখুন ত স্যর, এরকম জোয়ারের মুখে কেউ সাঁতার কাটতে পারে?

মুখটা তুলিয়া প্রতুল একবার গঙ্গার দিকে তাকাইল। তারপর অন্যমনস্কের মতই কহিল, তুমি ঠিক বলেছ রজনী। জলে ঝাঁপ দিলে ত আমরা তার শব্দই শুনতে পেতুম?

আকাশেও উড়লো না, জলেও ঝাঁপ দিলে না, তবে গেল কোথায়, স্যর?

প্রতুলের তরফেও এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিল না। আগাগোড়াই সে সাঙ্কো পাঞ্জা ও সুজাতাকে চোখের সামনে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ হয়ত তারা গতিবেগ একটু বাড়াইয়াছিল, ঘন কুয়াশার আবরণে প্রতুল দেখিতে পায় নাই, কিন্তু সেই অবসরটুকু তাদের পলায়নের পক্ষে ত পর্য্যাপ্ত নয়! তবে তারা গেল কোথায়? প্রতুলের বুক ঠেলিয়া নৈরাশ্যের একটা তিক্ত শ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

রজনীকে সে পুনরায় প্রশ্ন করিল,তুমি কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?

না, স্যর, আমি ত কিছু পাইনি, আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?

না, আমি ত কিছু শুনিনি।

আপনার কি একটুও সন্দেহ হয়নি?

সন্দেহ হলে ত আমি আগে থেকেই সাবধান হতুম।

রজনী সহসা পথের পাশের রেলিংএর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ওই রেলিং ধরে তারা বাইরের দিকে ঝুলছে না ত?

অত বড় একটা সম্ভাবনার কোনরূপ সমর্থন না করিয়া প্রতুল শুধু কহিল, পাগল!

কিন্তু স্যার, মনে করুন....

প্রতুল ধমক দিয়া কহিল, মনে আমি কিছুই করতে চাই না রজনী, চাই এ ব্যাপারের একটা সুমীমাংসা করতে। আমি জানি, তুমিও জান, যে কোন উপায়েই হোক্ সাঙ্কো পাঞ্জা সুজাতাকে নিয়ে পালিয়েছে। এখন কিছু মনে করার চেয়ে সেই উপায়টা কি—নির্দ্ধারণ করা আগে দরকার। প্রথমতঃ আমরা জানি, সাঙ্কো পাঞ্জা আর সুজাতা এই ব্রিজের ওপর ছিল; দ্বিতীয়তঃ জানি, তারা এখন আর এখানে নেই। তৃতীয়তঃ আমাদের দু'জনের দ্বারাই প্রমাণ হয়ে গেছে, তারা ব্রিজের রাস্তা দিয়ে পালায় নি, তাহলে আমরা দেখতে পেতুম। চতুর্থতঃ আমরা এটা মেনে নিচ্চি, তারা জলেও ঝাঁপ দেয়নি, আকাশেও ওড়েনি;....কিন্তু একটা কথা—এর মধ্যে বিশেষ দরকারী আর মূল্যবান কথাই এটা, অথচ আমি ভুলে যাচ্ছিলুম। সাঙ্কো পাঞ্জা মাঝে একবার মুখের ভেতর দুটো আঙুল পুরে একটা শিস্ দিয়ে উঠেছিল, শুনেছিলে ত?

রজনী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ স্যার, শুনেছি। কি বিকট...

শিস্ দিয়েছিল কেন বলতে পার?

হয়ত কাউকে সঙ্কেত করছিল।

ঠিক। সে সঙ্কেত করে তার অনুচরদের সাহায্য প্রার্থনা করছিল।

এ কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না, কারণ এই কথাটাই আমার মনে হয়, প্রতি পদে আমাদের সাহায্য করবে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই কথাটাই সমস্যাটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। কারণ সত্যই যদি সাঙ্কো পাঞ্জা সঙ্কেত করিয়া তার অনুচরদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তারা আসিলই বা কখন? সাহায্য করিলই বা কখন? সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি তার অনুচরদের নাই। তবে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, অদৃশ্য থাকিয়াই তারা....

রজনী এই সময় বলিয়া উঠিল, একটা কথা স্যর, কোন এরোপ্লেন টেরোপ্লেন এসে ওদের দু'জনকে তুলে নিয়ে যায় নি ত?

প্রতুল বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, তাহলে সেটা দেখা যেত না, কিংবা তার শব্দ শুনতে পাওয়া যেত না?

উত্তেজনাটা হঠাৎ কমাইয়া ফেলিয়া রজনী জবাব দিল, হয়ত এমন কোন এরোপ্লেন—চললে কোন শব্দ হয় না, অন্ধকারে দেখা যায়...

তার কথায় কান না দিয়া প্রতুল বলিয়া উঠিল, ওসব অসম্ভব কল্পনা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখন আসল কাজে নেমে পড়ি এস। এ সমস্যার সমাধান করতেই হবে।

আমার কি তাতে অমত আছে, স্যর?

বেশ, তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে।

আবার ছাড়াছাড়ি! কেন?

তুমি এই ব্রিজের ওপরেই পাহারা দাও, আমি অনুসন্ধান সুরু করি।

অনুসন্ধানটা কি করবেন, স্যর?

সাঙ্কো পাঞ্জাকে খুজে বার করব।

আপনি কি মনে করেন স্যর,সাঙ্কো পাঞ্জা এখনও কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে?

আমি কিছুই মনে 'করি না, সে কথা ত তোমাকে আগেই বলেছি রজনী। হয় আমি সাঙ্কো পাঞ্জাকে খুঁজে বার করব, নৈলে কি উপায়ে সে আমাদের ফাকি দিয়েছে, সেটা জানবার চেষ্টা করব।

রজনী অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল, কি ভাবে অনুসন্ধানটা করতে চান?

সম্ভব অসম্ভব যত রকমে পারি!

আপনার কি মনে হয়, এই ব্রিজের ভেতর লুকোবার মত কোন গুপ্ত গর্ত্ত আছে?

গুপ্ত গর্ত্ত না থাকে, গুপ্ত স্থান থাকাও সম্ভব।

কিন্তু....

'কিন্তু' আবার কি?

কথাটা স্যর, বলতে আমার সাহস হচ্চে না। অথচ যাঁদের নিমক খাই, তাঁদের কথা শুনতে গেলে....

তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া প্রতুল কহিল, ভয় নেই, কথাটা তোমার নির্ভয়েই বলতে পার।

রজনীর মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, আপনি অভয় না দিলে স্যর, কেটে ফেললেও আমি ও কথাটা আপনাকে বলতে পারতুম না। আমি বলতে চাই, এবার আমার কর্ত্তব্য পালনের সময় এসেছে।

কি তোমার কর্ত্তব্য?

কমিশনার সাহেব যে আপনাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, সেটা বোধ করি আপনার অজানা নেই ?

তাতে হয়েছে কি ? তুমিও কি আমাকে সন্দেহ কর ?

সন্দেহ আমি করি না, কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা কাজ সন্দেহেরই উদ্রেক করে।

তুমি কি মনে কর, আমি সুজাতা আর সাঙ্কো পাঞ্জাকে পলায়নে সাহায্য করছি ?

আমি হয়ত করি না, কিন্তু ঘটনা-স্রোতটা যে আপনার প্রতিকূলে বইচে, সেটা ত বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। আমি জোর করে বলতে পারি, সুজাতা দেবী আর সাঙ্কো পাঞ্জা আমার পাশ দিয়ে পালায় নি, তারা গেছে আপনার পাশ দিয়ে, তাদের পালাতে দেখেও আপনি বাধা দেন নি।

বেশ, তাই যদি তোমার মনে হয়, তাহলে কি করতে চাও ?

আমি কিছু করতে চাই না, কিন্তু কমিশনার সাহেব আমার পকেটে হাতকড়াটা দিয়ে দিয়েছেন।

প্রতুল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তাই নাকি ! তবে দাও, ওটা আমার হাতে পরিয়ে দাও। বলিয়া প্রতুল তার হাত দুটা প্রসারিত করিয়া দিল।

অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে রজনী পকেট হইতে হাতকড়াটা বাহির করিয়া প্রতুলের হাতে পরাইতে যাইবে, ঠিক সেই সময় প্রতুল সেটা কাড়িয়া লইয়া রজনীরই হাতে পরাইয়া দিল। রজনী কেমন ভ্যাবাচাকা হইয়া গিয়া বাধা ত দিলই না, একটা প্রতিবাদের কথাও উত্থাপন করিল না।

প্রতুল হাসিয়া বলিল, হাতকড়া কি করে পরাতে হয়, তোমাকে দেখিয়ে দিলুম রজনী, তুমি ত ঠিক জানতে না ?

রজনীর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, কমিশনার সাহেব যে মিথ্যে সন্দেহ করেননি, এতক্ষণ পরে তা আমি বুঝতে পারলুম।

প্রতুলের মুখে আবার সেই হাসি। কহিল, কিন্তু তুমি যে ভুল বুঝেছ, এটা তোমাকে কি করে বোঝাই বল ত ?

রজনী শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, প্রমাণ দিলেই বুঝব।

বেশ, প্রমাণই দিচ্চি।

প্রতুল সেই মুহূর্ত্তে রজনীর হাতকড়াটা খুলিয়া লইয়া তারই হাতে প্রত্যর্পণ করিল।

রজনী নির্ব্বাক্।

প্রতুল পুনরায় হাসিয়া কহিল, সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচর হলে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এখুনি মুক্ত করে দিতুম না, অন্ততঃ শাস্তির একটা ব্যবস্থা করতুমই, কেমন, নয় ?

রজনী তত্রাচ কোন কথা বলিল না।

প্রতুল তারপর বলিল, আসল কথাটা কি জানো রজনী, এ ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য চাই। তুমি রাজী ?

রজনী মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, আর লজ্জা দেবেন না স্যর ! আপনি আমার সাহায্য চান, একি কম সৌভাগ্যের কথা !

বেশ, তাহলে এখানে দাঁড়িয়েই তুমি পাহারা দাও, আমি চারদিকটা একবার ভাল করে দেখে শুনে নিই। কতক্ষণ লাগবে আর ? বড় জোর

ঘণ্টাখানেক। কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতুল ঘন কুয়াশার মাঝে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিস্তল হাতে রজনী একাকী সজাগ প্রহরায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রগাঢ় স্তব্ধতা। এক ঘণ্টা—রজনীর মনে হইল যেন এক যুগ।

দূরে—অতি দূরে কোন একটা পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। কিন্তু প্রতুল ফিরিল কৈ? অধীর উৎকণ্ঠায় রজনী প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচটা—তারপর ছয়টাও বাজিয়াও গেল, রাত্রির অন্ধকার ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া আসিল, তত্রাচ প্রতুল ফিরিল না।

সাত

বাড়ীর দরজাটা পার হইয়াই বিশু তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল। স্থানটা বিশেষ নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না; কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে ছদ্মবেশী পুলিশের আবির্ভাব বিচিত্র ত নয়ই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু সন্দেহ করিবার মত কোথাও কিছু দেখা গেল না। বিশু সোজা পথ ধরিয়া যতদূর সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রতুলের সহিত খেলা করিতে যাওয়া যে একান্ত ছেলেমানুষী হইয়াছে বুঝিতে তার বাকী ছিল না। সে ত ইচ্ছা করিলেই তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিত! কিন্তু তা ত করিলই না, বরং তার দেওয়া চুরুট বিষাক্ত জানিয়াও নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিল। ইহা হইতে কি স্পষ্টই বোঝা যায় না, তাকে বন্দী করা প্রতুলের উদ্দেশ্য নয়, সে চায় বিশু মুক্ত থাকিয়া যা করিতে পারে, করুক।

তাই করিবে সে। তার জন্য, সে আর চাহে না, প্রতুল চিন্তিত হোক্, বিপন্ন হোক। তাদের দুজনের একই লক্ষ্য সাঙ্কো পাঞ্জাকে ধৃত করা—প্রতুল যে পথে যাইতে চায়, যাক্, তার পথ বিভিন্ন।

এই বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াই সে একবার দেখিতে চায়, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সাঙ্কো পাঞ্জাকে করায়ত্ত করা যায় কি না।

অতঃপর প্রতুল যে কি করিবে, বিশু ভাবিয়া পাইল না। পুলিশ তাকে সন্দেহের চোখে দেখিয়াছে, বিশুর মুক্তি-সংবাদে সেই সন্দেহ সত্যে

পরিণত হইবে। ফলে দাঁড়াইবে এই—পুলিশের নিকট হইতে সে আর কোনরূপ সাহায্য পাইবে না। কি একটা অজ্ঞাত গুরুভারে বিশুর বুকের ভিতরটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। —

প্রতুল যেমন পুলিশের সাহায্য পাইবে না, তেমনি প্রতুলের সাহায্য পাওয়া তার পক্ষে দুরাশা। তবে সুনন্দাকে প্রতুল স্নেহ করে....

সুনন্দার কথা মনে হইতেই সে নিজেকে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া উঠিল, যাকে আমি মুক্তি দিয়েছি, সে কি সত্যই সুনন্দা ?

সুনন্দা কিনা—বাস্তবিকই সে জানে না, বুঝিতেও পারে নাই। প্রতুলই বুঝিয়াছে, প্রতুলই বলিয়াছে।

আগাগোড়া ঘটনাটা বিশু মনের ভিতর জড়ো করিয়া লইল। মেয়েটী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল এবং কণ্ঠস্বর গোপন করিবার অভিপ্রায়ে এত তাড়াতাড়ি কথা বলিয়াছিল যে, বিশু তাকে চিনিতে ত পারেই না, সুনন্দা বলিয়া ধারণা করিতেও সক্ষম হয় নাই।

গাড়ীটা যখন তার পশ্চাদ্ধাবিত পুলিশের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া দূরে আসিয়া পড়িল, মেয়েটীকে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, কোথায় নামবেন বলুন ত আপনি ?

মেয়েটি জবাব দিয়াছিল, যেখানে নামতে হবে, ঠিক সেইখানেই নামব। ভাববেন না, গাড়ী চালিয়ে যান আপনি...

বিশু গাড়ী চালাইতে লাগিল।

হঠাৎ একটা রাস্তার মোড়ে আসিতেই মেয়েটী অধীর আগ্রহে চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, এবার নামবার জায়গা এসে গেছে আমার।

মেয়েটি গাড়ী হইতে নামিল। যাইবার আগে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ রাত্রে কি আসার সুবিধে হবে আপনার ?

বিশু জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

বন্দীপুরের একটা বাড়ীতে। চেনেন ত বন্দীপুর ?....চারদিকে বন, মাঝে একখানা বাড়ী।

কখন যেতে বলেন ?

মাঝরাতে।

কি দরকার সেখানে, বলতে বাধা আছে কি ?

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, শুধু আমার প্রাণ বাঁচিয়েই আপনার কর্ত্তব্য শেষ করতে চান, না সাঙ্কো পাঞ্জার কবল থেকে মুক্ত করতে চান তার হতভাগ্য শিকারদের ?

বিশু স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সাঙ্কো পাঞ্জার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কি কি তীব্র ঘৃণাই না মেয়েটীর মুখ-চোখ দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল।

বিশু জানে, কন্যা হইলে কি হয়, সুনন্দা সাঙ্কো পাঞ্জাকে ঘৃণা করে, তার কুকীর্ত্তির কথা প্রচার করিতে দ্বিধা করে না।

বিশুর মন প্রতুলের কথাতেই সায় দিয়া উঠিল, এ নিশ্চয়ই সুনন্দা। সুনন্দাই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জার অমানুষিক কোন কাজে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছে।

হৃদয় তার অনুতপ্ত হইয়া উঠিল, কেন সে তখন ভালো করিয়া দেখিল না, কেন সে তখন চিনিতে চেষ্টা করিল না ?

বিশুর মুখের উপর পলকের জন্য একটা ম্লান ছায়া ভাসিয়া আসিল, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই তা অপসৃত হইয়া সমস্ত মুখখানা পুনরায় উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, খানিকটা পরেই ত আবার তার সহিত দেখা হইবে?

তারপর মনে পড়িল, সাঙ্কো পাঞ্জার হতভাগ্য-শিকারদের কথা। কে তারা? সাঙ্কো পাঞ্জার সহিতই বা তাঁদের কি সম্পর্ক? বন্দীপুরের বাড়ীতে কি তারা বন্দীই হইয়া আছে?

সাঙ্কো পাঞ্জার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে গেলে তার সহিত সংঘর্ষ যে অনিবার্য্য, বিশুর কোন সন্দেহই ছিল না! কিন্তু সে ত প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। তবে কি পুনরায় বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিবে?

কিন্তু....হঠাৎ এই 'কিন্তু'টা উদিত হইয়া বিশুর যুক্তির মূলে আঘাত করিল। এতক্ষণ হয়ত প্রতুল জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছে, কিংবা বাড়ীর আশে-পাশে ছদ্মবেশী পুলিশ আসিয়া প্রহরায় দাঁড়াইয়াছে। না, সেখানে যাওয়া আর চলে না, উচিতও নয়।

তাহা হইলে উপায়? উপায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতেই বিশু দৃঢ়পদে রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই নজরে পড়িল, প্রকাণ্ড একটা মাংসের দোকান। কি ভাবিয়া সেই দোকানটাতেই সে ঢুকিয়া পড়িল।

আধঘণ্টাটাক পরে বাহির হইল যখন,তখন তার মনটা খুশিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। ক্ষুন্নিবৃত্তি ত হইয়াছেই, তা ছাড়া আত্মরক্ষার জন্যে একটা অস্ত্রও সে সংগ্রহ করিয়াছে। দোকান হইতে একটু দূরে গিয়া পকেটের ভিতর মাংস-কাটা ছুরিটাকে একবার অনুভব করিয়া লইয়া নিজের মনেই সে বলিয়া উঠিল, নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো।

কালবৈশাখী

রাত্রি গভীর। কোনদিকে সাড়া-শব্দটী পর্য্যন্ত ছিল না। সহসা অদূরে একটা ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়া বিশু তাতে চাপিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ আগে এগারোটা বাজিয়া গেছে। গন্তব্যস্থানের পথ যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, এবং সময় যতই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল, উত্তেজনায় বিশুর বুকের রক্ত ততই উত্তাল হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো আছে কে বলিতে পারে?

গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া থামিতেই বিশু নামিয়া পড়িল। চারিদিকে বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত-বাগান বাড়'টিকে দেখিলে ধনীর বিলাস-কুঞ্জ বলিয়াই মনে হয়। একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বিশু চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

নিস্তব্ধ নির্জ্জন স্থান—কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। লোকের বসতিও এখানে অত্যন্ত কম; যা দু'চারিখানা বাড়ী আছে, বাগান-বাড়ীর আকারেই নির্ম্মিত।

বিশুর বুকটা দুলিয়া উঠিল। শত্রুর কবলে পড়িয়া এখানে যদি তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না। ভীষণ পরীক্ষা তার সম্মুখে! হয়ত আততায়ী বাড়ীটার আশে-পাশেই কোথাও আঁধারের সহিত মিশিয়া উদ্যত পিস্তল অথবা শাণিত ছুরিকা হস্তে শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া আছে। তাকে দেখিতে পাইলেই ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত আসিয়া তার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

কিন্তু দ্বিধা করিবার সময় ছিল না তখন। অতি সন্তর্পণে লঘুপদে সে বাড়ীটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বিশুর মনে হইল, আর কিছুক্ষণ পরে

এই অন্ধকারেরই মাঝে একটি নাটকের অভিনয় সুরু হইবে। কিন্তু কি যে সেই নাটক, এবং তার বিষয়-বস্তুই বা কি, বিশু এখনও জানে না—যদিও সেই নাটকের প্রধান ভূমিকাটা গ্রহণ করিতে হইবে তাকেই।

বাড়ীটাকে দেখিলে মনে হয় যেন পরিত্যক্ত, কেহই সেখানে বাস করে না। তবে কি সেই মেয়েটী তাকে মিথ্যা বলিয়াছে?

মনের কোণে সন্দেহ আসিয়া উঁকি দিল, প্রতুলের কথা অনুসারে মেয়েটি যদি সত্যই সুনন্দা হয়, সে মিথ্যা বলিবে? অনর্থক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন কি তার? মুক্তি?

তাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুনন্দা আজ তার পাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে কি প্রকারে?

বিশুর মাথার ভিতর সবটাই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। কথাটাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না, অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও অসাধ্য।...

অনর্থক দুশ্চিন্তায় ফল নাই ভাবিয়া বিশু তাড়াতাড়ি দ্বারসম্মুখের বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা টিপিয়া ধরিল।

মাথার ভিতর চিন্তাস্রোত তেমনিভাবেই হু হু করিয়া বহিয়া চলিল। সুনন্দা তাকে মিথ্যা বাক্যে ভুলাইবে, প্রতারণা করিবে? মনে পড়িল তার সুনন্দার সেই ফুলের মত নির্ম্মল পবিত্র মুখখানি—মিথ্যা-প্রতারণার স্থান ত সেখানে নাই। বিয়ের পর ক'দিন তারা এক সঙ্গেই কাটাইয়াছিল। বিশুকে সে যে অন্তরের সহিত ভালবাসে, তার কত-না প্রমাণই সে পাইয়াছে। সাক্ষো পাঞ্জার কন্যা—সাক্ষো পাঞ্জাকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে, শ্রদ্ধা করিবে, ইহাতে হয়ত অস্বাভাবিক কিছুই নাই, কিন্তু সে

নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছিল, হোক পিতা, অন্যায়কে সে চিরদিনই ঘৃণা করে, অমানুষিক হৃদয়হীনতার সহিত কোন সম্পর্কই তার নাই।

ঘণ্টা টিপিবার পর কতক্ষণ কে কাটিয়াছে, বিশু তা জানে না ; হঠাৎ কে একজন ভিতর হইতে দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কি দরকার আপনার ? কাকে চান ?

মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করিয়া বিশু বলিল, আমার আজ এ সময় এখানে আসবার কথা ছিল, তুমি এই কার্ডখানা নিয়ে যাও…

বিশু তার পকেট হইতে একখানা নামের কার্ড বাহির করিয়া লোকটির দিকে আগাইয়া ধরিল।

লোকটি কিন্তু কার্ডটা গ্রহণ করিল না ; বলিল, কার্ডের দরকার নেই, অন্ধকারে আপনাকে চিনতে পারিনি, কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছি। আসুন বিশুবাবু, ভেতরে আসুন।

অপরিচিত লোকটির মুখে বিশু তার নাম শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। চেনা ত দূরের কথা, কোনদিন সে তাকে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারিল না।

অন্ধকারের ভিতরই অগ্রসর হইতে হইতে লোকটি বলিল, দুর্যোগের কথা কেন আর বলেন ! ইলেকৃট্রিক আলোর যা গতিক—হঠাৎ গেল সব এক সঙ্গে নিভে। বাড়ীতে একটা এমন বাতি নেই যে জ্বালি। … আপনার বড় অসুবিধা হচ্ছে, না ? আপনি বরং এক কাজ করুন, আমার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে পাশে পাশে আসুন।

বিশু বুঝিতে পারিল না, এই অন্ধকার স্বেচ্ছাকৃত, না সত্যই বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব। এর ভেতর কোন ফাঁদ নাই ত ?

কিন্তু প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন ধারণাকেই মানিয়া লওয়া বিশুর স্বভাব নয় ; তাই সে অপরিচিতের কাঁধে হাত দিয়া একান্ত নির্ভরশীলের মতই অগ্রসর হইতে লাগিল।

লোকটী বলিল, এবার বাঁদিকের ওই সিঁড়ি···দোতলায় উঠতে হবে আমাদের। নিচেটা যেমন অন্ধকার দেখছেন, ওপরটা কিন্তু ঠিক তেমন নয়। লোকের মুখটাও অন্ততঃ দেখা যায়, এমনি আলো বারান্দায় আছে। সেখানেই বসাবো আপনাকে। দেখবেন হোঁচট লাগে না যেন।

দ্বিতলের বারান্দায় খানকয়েক চেয়ার পাতা ছিল, বিশুকে তারই একটা দেখাইয়া দিয়া লোকটী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

আট

সুনন্দা-ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা ছায়াছবির মতই বিশুর মানস-চক্ষে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুনন্দাকে সে মনে মনে ভালই বাসিত, স্বপ্নেও কখন কল্পনা করে নাই যে, কোনদিন তার সহিত মিলন সংঘটিত হইবে। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধন করিল প্রতুল—সাক্ষো পাঞ্জার সহস্র বাধা-বিপত্তি চরণ-তলে দলিত করিয়া। বিবাহের পর তারা একত্রই বাস করিতেছিল, কিন্তু ক'দিন? সুনন্দাই একদিন বলিল,আর না, আর আমরা এক সঙ্গে থাকব না, থাকা উচিতও নয়।

বিশু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

সুনন্দা কৈফিয়ৎ দিল, আমাদের এ বিবাহে বাবার মত ছিল না, এখনও তিনি তোমাকে তাঁর কন্যার স্বামী বলে মেনে নেন নি। কাজেই দু'জনে আমরা এক সঙ্গে থাকলে তিনি যে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবেন, এটা খুব সত্যি। সে অন্যায়টা তাঁকে করতে দিই কেন?

সুনন্দা সেইদিনই তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, কোথায়—তা বিশু জানিত না। তারপর হইতে একদিনও আর উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রতি মুহূর্তেই সুনন্দার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিবার আকাঙ্ক্ষায় বিশু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অন্ধকারের মাঝেই আত্মগোপন করিয়া বারান্দার ওধার হইতে কে বলিয়া উঠিল, নমস্কার বিশুবাবু!

বিশুর মনটা যেন সেই মুহূর্ত্তে পর্ব্বতের শিখর হইতে গড়াইয়া, তার পাদমূলে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কণ্ঠস্বর যারই হোক্, সুনন্দার যে নয়, তাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

অদৃশ্য লোকটি পুনরায় বলিল, এরকমভাবে অভ্যর্থনা করার জন্য আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি, বিশুবাবু!

চুপ করিয়া থাকটা আর শোভন নয় ভাবিয়া বিশু বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এরকম ভাবে...মানে?

লোকটি পরিষ্কার গলায় কহিল, মানে এই গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

বিশু সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, তাহলে এই অন্ধকারটা আপনার ইচ্ছাকৃত?

সত্যি কথা বলতে গেলে স্বীকার করতেই হয়।

এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন গোপন উদ্দেশ্য লুকানো আছে?

হ্যাঁ, সেটাও স্বীকার করছি!

সে উদ্দেশ্যটা কি জানতে পারি? আমার কাছে কি চান আপনি?

কিছুই না। উদ্দেশ্য—যতক্ষণ না আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা সন্তোষজনক চুক্তি হচ্চে, ততক্ষণ আপনিও থাকবেন অন্ধকারে, আমিও থাকব অন্ধকারে। পরস্পরের দেখা হবে না!

চুক্তিটা কি?

তাও এমন বিশেষ কিছু নয়। আপনার আমার মধ্যে যে কথাবার্ত্তা

হবে, সেগুলো যদি কখন ভুলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সেই মুহূর্ত্তে ভুলে যাবেন।

কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, আপনি কে?

লোকটি ধীর শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, আমি জানি বিশুবাবু, কি নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়েই না সময়টা আপনি কাটাচ্চেন! আপনার মত অবস্থায় পড়লে আমাকেও যে ওইভাবে কাটাতে হত, তাও আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করব বলুন? আপনার কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন কথাই আমি প্রকাশ করতে পারছি না।

বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে। কোন দিক থেকে আমার ক্ষতি হবে না ত?

সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিলুম।

আর সেই সঙ্গে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্চি, এখন থেকে আপনার আমার মধ্যে কোন কথাই গোপন থাকবে না। তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দাটা বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ আলোর অত্যুগ্র দীপ্তি সহ্য করিতে না পারিয়া বিশু চোখ দুটা বুজাইয়া ফেলিল এবং পর মুহূর্ত্তে চোখ মেলিতেই দেখিতে পাইল, তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি যুবা। দীর্ঘ দেহ, বলিষ্ঠ গঠন, বুদ্ধি-উজ্জ্বল নেত্র, উন্নত ললাট।

তার পানে তাকাইতেই যুবকটি তার হাত দুটা যোড় করিয়া বিনয়-

নম্র কণ্ঠে কহিল, তৃতীয় ব্যক্তির অভাবে নিজের পরিচয় নিজেকেই দিতে হচ্চে। আমি সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর কপিঞ্জল!

কল্পনার যে বসন্ত-বাতাস এতক্ষণ বিশুর চারিপার্শ্বে তার গন্ধ দিয়া, স্পর্শ দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, হঠাৎ যেন তাহাই ঝড়ে পরিণত হইয়া তার সমস্ত মাধুর্য্যটুকু নিঃশেষে উড়াইয়া লইয়া গেল। কোন রকমে শুষ্ক কণ্ঠে সে কহিল, আপনার পরিচয় পেয়ে আনন্দিতই হলুম।

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটাই সূর্য্যকিরণের মত নির্ম্মল হইয়া বিশুর সম্মুখে প্রকাশ পাইল। সে যে পুলিশের কবল হইতে সুনন্দাকে উদ্ধার করিয়াছে, যে কোন প্রকারেই হোক সাঙ্কো পাঞ্জা জানিয়াছে এবং তার সহিত ইহাও জানিয়াছে যে, সেই মিলনোন্মুখ দুটি তরুণ হৃদয় আজ আবার এক সঙ্গে মিলিবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার কল্পনাও তার অসহ্য, তাই সে সুনন্দাকে আটক রাখিয়া তার পরিবর্ত্তে পাঠাইয়াছে প্রধান অনুচর কপিঞ্জলকে। কপিঞ্জলকে সে কি আদেশ দিয়াছে, কে জানে?

একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া কপিঞ্জল বিশুর কথার উত্তরে বলিল, আনন্দিত হয়েছেন! কিন্তু আমার মনে হয়, আনন্দিত আপনি মোটেই হন নি, হয়েছেন হতাশ, বিস্মিত। কেমন, তাই নয়? যাই হ'ন আপনি, সত্যিই আপনার সাহসের সীমা নেই।

আত্ম-প্রশংসায় বিরক্ত হইয়া বিশু বলিল, আমাদের পরস্পর সাক্ষাতের সঙ্গে এ কথার কোন সম্পর্ক আছে কি?

আছে বৈকি, নিশ্চয় আছে। আপনি আমাদের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তাটা জানতে খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন, না?

তা একটু উঠেছি বৈকি তবে সে কৌতূহলের কতটুকু যে আপনি পূরণ করতে পারবেন, তা ভেবে উঠতে পারছি না।

বেশ, আপনার ইচ্ছামত প্রশ্ন করুন আমাকে।

ধন্যবাদ। প্রথমতঃ আমি জানতে চাই, কিরূপে আজ আপনার আমার মধ্যে এ সাক্ষাৎকার সম্ভব হল?

বিশেষতঃ আপনি যখন আমার ঠিক বিপরীত-প্রকৃতি একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, কেমন, তাই ত?

কথাটা আমার ঠিকই ধরতে পেরেছেন আপনি।

এ প্রশ্নের উত্তরে আপনাকে শুধু এই কথাটাই বলতে পারি, যে মহিলাটির কথা আপনি বলছেন, তাঁরই অনুরোধে আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

কোন প্রমাণ আছে তার?

না।

সে মহিলাটির নাম আপনি বলতে পারেন আমাকে?

না।

আপনার পরিবর্ত্তে আমি যদি বলি সে মহিলাটির নাম...

বাধা দিয়া কপিঞ্জল বলিয়া উঠিল, যেখানে একজন মহিলাকে নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে কোন নাম না বলাই ভালো। নয় কি?

অতঃপর ধৈর্য্য রক্ষা করা বিশুর পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। যুবকটির কণ্ঠস্বরও যেমন বিদ্রূপাত্মক, কথা বলার ভঙ্গীও তেমনি। অধীর হইয়া উঠিয়া সে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিল, কে এই লোকটি? উত্তর মিলিল সঙ্গে সঙ্গেই। এই লোকটি নিশ্চয়ই সেই—যার সহিত সাক্ষো

পাঞ্জা চাহিয়াছিল সুনন্দার বিবাহ দিতে। বুকে তার জ্বলিয়া উঠিল ঈর্ষার আগুন। কোন রকমে মনোভাব গোপন করিয়া সে সহজ কণ্ঠেই বলিবার চেষ্টা করিল, তবে আসুন, যত শিগগির সম্ভব আমাদের এ অভিনয় শেষ করি। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন বা না দিন, আমাকে নিয়ে যা করবার আদেশ আছে আপনার, এক্ষুনি শেষ করে ফেলুন।

কপিঞ্জল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, সাহস আপনার অসীম সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে অধৈর্যটাও সম পরিমাণে আছে দেখছি!

বিশু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল; আমাকে পরিহাস করবার জন্যেই কি আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে?

মোটেই নয়। আপনি যে আমার বন্ধু বিশুবাবু! বন্ধুকে বন্ধু কখন পরিহাস করতে পারে?

বন্ধু! অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল বিচিত্র একটা ভঙ্গীতে মাথা দোলাইয়া কহিল, আপনি কি আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব অস্বীকার করেন?

বিশু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু আমরা ত সত্যিকার বন্ধু নই, বরং আপনি আমাকে শত্রু বলেই ধরে নিতে পারেন, কারণ যার অধীনে আপনি কাজ করেন, সে আমার শত্রু...

তার শত্রু আপনি হতে পারেন, কিন্তু আমরা দুজনেই কি আজ একই লোকের সাহায্যে অগ্রসর হইনি?

একই লোকটি কি সুনন্দা নয়?

মাপ করবেন বিশুবাবু, কারও নাম করবার অধিকার আমার নেই।

বিশু পুনরায় অধীর কণ্ঠে কহিল, কি বলতে চান আপনি এবং কি বলবার জন্যেই বা আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে, দয়া করে তাড়াতাড়ি শেষ করে নিন।

কপিঞ্জল সজোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এতক্ষণ পরে আপনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন, যার সম্পূর্ণ জবাব দিতে আমার একটুও আপত্তি নেই।

আপত্তি যখন নেই, তাড়াতাড়ি শেষ করে আমাকে অব্যাহতি দিন।

কিন্তু শেষ হলেই যে আপনি অব্যাহতি পাবেন, কে বললে আপনাকে? কথাশেষের পরই তো আসল কাজের আরম্ভ।

বেশ, কথা শেষ করুন।

কপিঞ্জল সুরু করিল, বিশুবাবু, একটু আগেই আপনি যে কথাটা বলেছেন, সেটা খুবই সত্যি। যাঁর অধীনে আমি কাজ করি, তাঁর শত্রু আপনি। তা বলে ভুলেও ধারণা করে বসবেন না যেন, আজ আমার এখানে আসার পিছনে যে উদ্দেশ্য লুকোনো আছে, তা আমার প্রভুরই দাসত্বের অঙ্গীকার—বরং ঠিক তার বিপরীত।

তাহলে কি আপনি তার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চান?

কপিঞ্জল জিভ কাটিয়া বলিল, অভিযান! কথাটা বড্ড গুরুতর, অতখানি আমি আশা করে নি।

তাহলে বোধ হয় ধরে নিতে পারি, বিশ্বাসঘাতকতা?

কপিঞ্জল পুনরায় জিভ কাটিল; কহিল, না, না, অতটা সাহসও আমার নেই। এ দুটোর কোনটাই আমি চাই না, যুদ্ধও না, বিশ্বাস-

ঘাতকতাও না। আমি চাই, যে সব কাজে তার সঙ্গে আমার মনের মিল হয় না, সেই সব কাজে তাঁকে বাধা দিতে।

তাতে কি আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে?

তা অবিশ্যি নেই, কিন্তু সেগুলোকে আমি কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না।

কেন?

কারণ সে কাজগুলো এমন একজনকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে —যে আমার প্রিয়।

অর্থাৎ যাকে আপনি ভালবাসেন? বিশুর কণ্ঠে ছিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাস।

কপিঞ্জল হয়ত ধরিতে পারিল না; তেমনি আন্তরিকতার সহিত কহিল, হ্যাঁ, যাকে আমি ভালবাসি।

বিশু প্রশ্ন করিল, সে কি সুনন্দা? তার দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল কহিল, আমাদের দু'জনের মুখে কারো নাম স্পষ্ট উচ্চারণ না করাই ভাল। তবে আপনার কৌতূহল নিবারণের জন্যে আমি এইটুকু বলতে পারি, যাকে আমি ভালবাসি, তার নাম সুনন্দা নয়, শোভনা।

বিশু বুঝিতে পারিল না, কে এই মেয়েটি? সুন্দরীকে সে চিনিত, সুন্দরী সুজাতাকেও সে চেনে। শোভনা সুনন্দাও তার অপরিচিত নয়, কিন্তু শোভনা কে? শোভনাই কি সুনন্দা?

তাকে চুপ করিতে থাকতে দেখিয়া কপিঞ্জল পুনরায় কহিল, কথাটা

আমার ঠিক বুঝতে পারেন নি বোধ করি? তবে, বুঝিয়ে বলি, শুনুন। আমার মতের বিরুদ্ধে মনিব আমার কাজ করতে যাচ্ছেন দেখে আমি তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছিলুম, ঠিক এমনই সময় দৈব-দুর্বিপাকে আপনিও তার ভেতর জড়িয়ে পড়লেন। অর্থাৎ সাঙ্কো পাঞ্জার ধনরত্ন....

তার কথার মাঝখানেই বিশু বলিয়া উঠিল, সাঙ্কো পাঞ্জার ধনরত্ন মানে তার চুরি করা সম্পত্তি ত?

চুরির কথাটা আমি নেই বা বললুম? তাঁর ধনরত্ন স্থানান্তরিত করার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন যিনি, তাঁকেই করলেন আপনারা বন্দী।

বিশু পুনরায় অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করিল, কিন্তু সে কি সুনন্দা নয়?

কপিঞ্জল মৃদু হাসিয়া বলিল, আগেও আপনাকে বলেছি, এখনও বলছি, কারও নাম আমি বলব না, বলতে পারব না, নিষেধ। আশা করি, বার বার অনুরোধ করে আমাকে লজ্জিত করবেন না আপনি।

কপিঞ্জলের কথা শুনিয়া বিশু কখন যে তার ঠোঁট দুটা কামড়াইয়া ধরিয়াছে বলিতে পারে না। টের পাইল তখন, যখন সেখান দিয়া রক্ত ঝু ঝিয়া পড়িতেছে। ঠোঁটের উপর জিভটা বুলাইয়া লইয়া কহিল, বেশ, আপনার নিষেধ-বাণী আর অগ্রাহ্য করব না। তারপর বলুন আপনি।

কপিঞ্জল বলিল, আমি বলছিলুম কি জানেন? এ ঘটনার ওপর দৈবের প্রভাবই বেশী। তা নৈলে দেখুন না, বন্দীকে আপনি দিলেন মুক্ত, আর সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশে আমাকে গিয়ে চাইতে হল তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ।

তাহলে ধনরত্ন স্থানান্তর করার আদেশ সাঙ্কো পাঞ্জা দেয় নি ?

কপিঞ্জল বিস্মিতের ভঙ্গীতে কহিল, আপনি আমাকে অবাক করলেন বিশুবাবু ! আপনি যে মহিলাটির বন্দীত্বমোচন করেছিলেন, কোনদিন তিনি কি কারো আদেশ মাথা পেতে নিয়েছেন ? চিরকালই নিজের ইচ্ছায় কাজ করেন তিনি....

বিশু সহসা উত্তেজিত হইয়া কহিল, তাহলে সে নিশ্চয়ই স্ব...মাপ করবেন, আবার অন্যায় করে ফেলেছি।

কপিঞ্জল বলিতে লাগিল, যাক্ সে কথা। তাঁকে প্রশ্ন করে আমি জানতে পারলুম, তাঁর উদ্দেশ্য যা, আমার উদ্দেশ্যও তাই। তবে আমি সাঙ্কো পাঞ্জার মতে মত দিই নি যে কারণে, ঠিক সেই কারণেই যে তিনি এ কাজে বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তা নয়। আমি চেয়েছিলুম, সাধারণের সর্ব্বনাশ যাতে না হয় ; আর তিনি চেয়েছিলেন এই কাজটায় যার সর্ব্বনাশ হবে, তাকে রক্ষা করতে।

আর বোধ করি বলবার প্রয়োজন হবে না, আমি বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি কে সে মহিলা—অবিশ্যি তার নামোল্লেখ আমি আর করব না—নিরপরাধ দেশবাসীর জন্যে যার প্রাণ কেঁদে ওঠে, সাঙ্কো পাঞ্জার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবার জন্যে যে সাঙ্কো পাঞ্জারই আহৃত ধনরত্ন স্থানান্তরিত করতে সাহস করে।

বুঝতে পারা হয়ত আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু বাকীটা আমায় এবার শেষ করতে দিন। জানতে পারলুম যখন, কারণ এক না হলেও দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, তখন আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি খাড়া করে

তুলতে বিশেষ বিলম্ব হল না। তিনি আমার সাহায্য চাইলেন, আর আপনি যে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত, এ কথাও আমায় জানালেন।

কাজটা কি জানাতে বাধা আছে?

কাজটা হচ্ছে এই—সাঙ্কো পাঞ্জার ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে তার অনুচরদের জানানো যে, সেগুলো চুরি গেছে। তা হলেই তাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হবে, তারা আর সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ মেনে চলতে রাজী হবে না।

আপনি এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন?

নিশ্চয়ই। কারণ আমি দেখলুম, বিফল হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর যতখানি, সফল হওয়ার সম্ভাবনা আমার ঠিক ততখানিই।

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর সাঙ্কো পাঞ্জারই বিরুদ্ধে—একথা কি তিনি বিশ্বাস করেছেন?

না, করেন নি। কিন্তু আমি যখন তাঁকে বললুম, আপনিও আমার সঙ্গী হবেন, তখন তিনি বিশ্বাস না করে পারলেন না।

বিস্ময়ে বিশুর দুই চোখ বড় বড় হইয়া উঠিল; কহিল, আমি আপনার সঙ্গী হবো?

হ্যাঁ, সেই রকমই কথা দিয়েছি তাঁকে।

আমার সম্মতি না নিয়েই?

আমি জানি, এ কাজে সহায়তা করতে আপনি কখন অমত করবেন না।

কিন্তু আমি যে আপনার কথায় কোনমতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।

পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া কপিঞ্জল বিশুর সামনে মেলিয়া ধরিল। কহিল, দয়া করে আপনি এটা পড়ে দেখুন বিশুবাবু!

চিঠিখানার হস্তাক্ষর দেখিতে দেখিতে বিশু বলিয়া উঠিল, নিঃসন্দেহ—সে যে সুনন্দা...

বাধা দিয়া কপিঞ্জল অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, দয়া করে আগে পড়ুন ওটা।

চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত। বিশু পড়িতে লাগিল :

অতীতের যে মধুর দিনগুলির কথা আমি এখনও ভুলতে পারিনি, জীবনে ভুলব বলেও মনে হয় না, তা যদি তোমার স্মরণে থাকে, এবং অতীতের যে বিশুকে আমি ভালবাসতুম, তুমি যদি সেই নির্ভীক, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, উন্নতমনা বিশুই হও, তাহলে কপিঞ্জল যা বলবেন তোমাকে, মন দিয়ে শুনো। তুমি যদি ঠিক এই সময় উপস্থিত থাকতে আমার সামনে, তাহলে দেখতে, তোমার কাছে এই বাণী পাঠাতে গিয়ে হাত দুটো আমার কি রকম কাঁপছে! ওগো! তুমি জান না, কি ভয়ানক বিপদের ভেতর তোমাকে আমি পাঠাচ্ছি। পাঠাচ্ছি, কারণ না পাঠিয়ে কোন উপায় নেই। তুমি যদি এই পত্রবাহকের সঙ্গে যেতে রাজী হও, তাহলে আমার মনে হয়, হাজার হাজার লোকের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হবো আমরা!

পত্রের তলদেশে যেমন লেখিকার কোন স্বাক্ষর ছিল না, তেমনি ছিল না গোড়ার দিকে কোন সম্বোধন।

বিশু বুঝিতে পারিল, পিতার অজ্ঞাতে চিঠি লিখিতে হইলে এ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে বিশুর চোখ দুটা সজল হইয়া আসিয়াছিল। কোনমতে জল নিরোধ করিয়া কহিল, এতেই হবে, আর বেশি কিছু চাইনি। আমি আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত। কি করতে হবে আদেশ করুন।

কপিঞ্জল গম্ভীর মুখে কহিল, কাজটা এমন বিশেষ কিছু কঠিন নয়। আপনি সদা-সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকবেন, আর যদি প্রয়োজন হয়, সাঙ্কো পাঞ্জার জীবন-রক্ষায় সাহায্য করবেন আমাকে।

বিস্ফারিত চোখে কপিঞ্জলের দিকে তাকাইয়া বিশু বলিয়া উঠিল, আপনার কি মাথার গোলমাল হয়েছে কিছু?

বিশুর কথায় কপিঞ্জলের মুখের কোন রেখাই পরিবর্ত্তিত হইল না। সে তেমনিভাবেই বলিতে লাগিল, এই রকম একটা কিছু মনে হওয়াই স্বাভাবিক! আগে আপনি শুনে নিন যে চুক্তির জন্যে আমি এখানে এসেছি এবং আপনাকে যা করতে হবে....

বলিয়াই সে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া লইল; তার পর পুনরায় সুরু করিল, শুনুন বিশুবাবু, আজ আমি আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান প্রধান অনুচরেরা এক সঙ্গে মিলবে। তাদের সভায় গিয়ে আমি ঘোষণা করব, সাঙ্কো পাঞ্জার সমস্ত ধনরত্ন চুরি হয়ে গেছে, সুতরাং যে কার্য্যতালিকা আমাদের স্থির হয়েছিল, তা বাতিল। শুধু এই ক'টি মনে রাখবেন বিশুবাবু, শুধু এই কথা কটাই সহস্র সহস্র প্রাণীর জীবন রক্ষা করবে।

তার পর?

সেই মহিলাটী পড়েছেন উভয় সঙ্কটে, একদিকে তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টা আর অন্যদিকে তাঁর....কথাটা তার অর্দ্ধ-সমাপ্তই রহিয়া গেল।

শেষ করিল বিশুই। বলিল, তাঁর পিতার মৃত্যুর আশঙ্কা।

কপিঞ্জল ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল; না, সাঙ্কো পাঞ্জার মৃত্যুর আশঙ্কা। তাই তিনি কেবল এক সর্ত্তে কাজ করতে রাজী হয়েছেন যে আমরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও সাঙ্কো পাঞ্জাকে রক্ষা করব। হ্যাঁ, এর মধ্যে আর একটা কথাও আপনাকে বলে রাখি, যে মুহূর্ত্তে সাঙ্কো পাঞ্জা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আপনি মুক্ত অর্থাৎ সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আপনি সাঙ্কো পাঞ্জার শত্রুভাবে কাজ করতে পারবেন। এবং আমরা দু'জন অর্থাৎ আপনি ও আমি তার পর থেকে আর পরস্পরকে চিনতেও পারব না। এই হল আমাদের সর্ত্ত! রাজী আছেন আপনি?

বিশু মহা সমস্যায় পড়িল। এতদিন যাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টার আর অন্ত ছিল না, আজ কিনা তাকেই রক্ষা করিবার নিমিত্ত তার পক্ষভুক্ত হইয়া অপরের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। তার নিকট এই অনুরোধ বাণী পাঠাইয়া সুনন্দা, কি একান্ত নির্ভরশীলতার পরিচয় দেয় নাই? সে জানে, বিশু কখন তার অনুরোধ এড়াইতে পারিবে না। শুধু কি তাই? তারই সম্মতির উপর আজ সহস্র সহস্র লোকের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

মনের কথাই বিশু মুখে প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী।

কপিঞ্জল খুসী মুখে বলিল, বেশ! তাহলে সেই সভায় আপনাকে

নিয়ে যাবার আগে কতগুলো সাবধানতা-মূলক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কারণ সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরেরা যদি কোন রকমে আপনাকে দেখতে পায়, তাহলে সেখান থেকে জীবিতাবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব হবে না।

ব্যবস্থাটা কি রকম করতে চান ?

এইমাত্র যে ধনরত্ন স্থানান্তর করার ইতিহাস আপনাকে বললাম, সেগুলো একটা সিন্দুকের ভেতর ভরা ছিল। এখন সেই সিন্দুকটা খালি; সেই সিন্দুকের ভেতর বন্ধ করে আপনাকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

যদি তারা সিন্দুকটা খুলে দেখে ?

খুলে যে দেখবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, তবে ওজন করে দেখতে পারে। ওজন করে দেখলে কোন ক্ষতি নেই, কারণ অত বড় একটা সিন্দুক যদি শুধু সোনায় ভর্ত্তি থাকে, তবে তার তুলনায় আপনি ভেতরে থাকা স্বত্ত্বেও তারা খালি বলেই মনে করবে। বুঝেছেন এবার ব্যাপারটা ?

বুঝেছি। তার পর ?

সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরেরা যদি বিনা প্রতিবাদে এই ধনরত্ন চুরির কথা মেনে নেয়, তাহলে সেখানে আপনার কিছু করার প্রয়োজন হবে না, সভাভঙ্গের পরই আপনি নির্ব্বিবাদে চলে আসতে পারবেন। কিন্তু তারা যদি বিপ্লবের সৃষ্টি করে, তাহলে সাঙ্কো পাঞ্জাকে রক্ষা করবার জন্যে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়াতে হবে আপনাকে। সাঙ্কো পাঞ্জা, আপনি আর আমি যদি দাঁড়াই এক সঙ্গে, তাহলে এমন কারো সাধ্য নেই আমাদের পরাজিত করে। তারপর যুদ্ধশেষে যাতে আপনি নির্ব্বিঘ্নে সে স্থান ত্যাগ করতে পারেন, তারও বিধিমত ব্যবস্থা করব আমি। এতে আশা করি, আপনার কোন অমত নেই ?

বিশু সম্মতি দিয়া কহিল, কথা দিয়ে আমি কখন তা প্রত্যাহার করি না।

কপিঞ্জল মৃদু হাসিয়া কহিল, তা আমি জানি এবং জানি বলেই সেই মহিলাটিকে অভয় দিতে পেরেছিলুম। সময় সংক্ষেপ, এবার আমাদের যেতে হয়।

চলুন।

বিশুর কণ্ঠস্বর শান্ত হইলেও অনাশঙ্ক একটা বিপদের আশঙ্কায় তার বুকের ভিতর উত্তাল রক্তস্রোত দ্রুতগতিতে উঠা-নামা করিতেছিল। সত্যই সে কি সাধো পাঞ্জার আহূত রাস্তায় চলিয়াছে, না তারই কোন পাতা ফাঁদে পা দিতে উদ্যত হইয়াছে? কোন্‌টা সত্য?

কত বড় বিপদের মধ্যে যে মাথা গলাইতে চলিয়াছে সে, বুঝিতে পারিলেও মনে মনে তার যথেষ্ট ভরসা ছিল, এর ভেতর আছে সুনন্দার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। যত বড় বিপদই সম্মুখীন হউক, জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আরব্ধ কার্য্য তাকে শেষ করিতেই হইবে।

কপিঞ্জল আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতেছিল, পিছনে ছিল তার বিশু। একটা ঘরের ভিতর দিয়া আর একটা ঘরে যাইবার পথ। তার পরই বাহির হইবার দরজা। দরজার সামনে অগ্রসর হইয়া কপিঞ্জল কহিল, আসুন বিশুবাবু, এই দিকে।

বিশু দরজা দিয়া মাথা গলাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে প্রহরায় দাঁড়াইয়াছিল যে লোকটা, হঠাৎ সে তার হস্তধৃত পিস্তলটা বিশুর মাথা লক্ষ্য করিয়া উঁচাইয়া ধরিল। বিশুর কানে কানে কে যেন বলিল, সাবধান, বিশু সাবধান!

বিশু নির্ব্বিকার। প্রাণের মমতা লইয়া স্বেচ্ছায় সে শত্রুর গহ্বরে পদার্পণ করে নাই।

কপিঞ্জল চোখের ইঙ্গিতে লোকটিকে পিস্তলটা নামাইয়া লইতে বলিয়া তার তারিফ করিয়া উঠিল, বাঃ বাঃ গিরিধারী! আমার জীবনের ওপর তোমার দরদই দেখছি আমার চেয়ে বেশী। ব্যস্ত হয়ো না, ইনি আমার বন্ধু!

লোকটি পিস্তলটা তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লইয়া বিশুকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল এবং কপিঞ্জলও সঙ্গে সঙ্গে করযোড়ে ক্ষমা চাহিয়া লইল।

পিছন দিককার দরজা দিয়া বাহির হইতেই দেখা গেল, একখান লরী রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া আছে। কপিঞ্জল লরীটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, যে সিন্দুকে আপনাকে লুকিয়ে রাখার কথা বলেছিলাম, ওই সেই সিন্দুকটা। যে মুহূর্ত্তে আপনি ওর ভেতর ঢুকে বসবেন, সেই মুহূর্ত্তেই লরীটা গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে রওনা হবে।

বিশু ধীরে ধীরে লরীটার দিকে অগ্রসর হইল।

কপিঞ্জল পুনরায় কহিল, আরো একটা কথা আপনাকে বলে রাখা ভাল। সিন্দুকের গায়ে ওই যে তালাটা লাগানো দেখছেন; ওটা বন্ধ হয় না, অথচ দেখলে মনে হয় যেন বন্ধই আছে। কারিকরের এমনি কেরামতি!

বিশু লরীর উপর উঠিল।

কপিঞ্জল বলিল, হ্যাঁ, আরো একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, সেটাও কিন্তু আসল। আত্মরক্ষার জন্যে কোন অস্ত্র-শস্ত্র আছে ত আপনার কাছে?

এত বড় বিপদের মধ্যেও বিশুর হাসি আসিল। পকেট হইতে সেই মাংস-কাটা ছুরিখানা বাহির করিয়া, কপিঞ্জলের চোখের সামনে ধরিয়া কহিল, একমাত্র এই জিনিষটা ছাড়া আমার আর কোন অস্ত্রই নেই।

কপিঞ্জল গভীর বিস্ময়ে কহিল, শুধু এই নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন? অথচ জানেন, যদি কেউ আপনাকে আক্রমণ করে, তাহলে এ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতেও পারবেন না?

উত্তরে বিশুর মুখে পুনরায় হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল বলিয়া উঠিল, সত্যি আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বিশুবাবু। এই নিন তবে আমার পিস্তলটাই। আজকের ঘটনাগুলোর ভেতর কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে, না? তা নৈলে সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর তার নিজের অস্ত্র তুলে দেয় সাঙ্কো পাঞ্জার চিরশত্রু বিশুবাবুর হাতে?

পিস্তলটা পরীক্ষা করিতে করিতে বিশু উত্তর দিল, শুধু এটাকেই বা অস্বাভাবিক বলছেন কেন, সাঙ্কো পাঞ্জার সংস্রব আছে যেখানে, সেখানে স্বাভাবিকতার একটু ছোঁয়াচও নেই।

পিস্তলের মুখটায় অতি ক্ষুদ্র আকারে 'স' অক্ষরটা খোদাই করা ছিল। বিশু বুঝিল, পিস্তলটা কপিঞ্জলের নয়, সাঙ্কো পাঞ্জার। কিন্তু এ সম্বন্ধে সে আর কোন উচ্চবাচ্যই করিল না।

তালাটাতে সত্যই চাবি দেওয়া ছিল না। ধীরে ধীরে সিন্দুকের

ডালাটা তুলিয়া বিশু তার ভিতর প্রবেশ করিল। ঠিক এই সময় আবার কে যেন তার কানে কানে কহিল, সাবধান বিশু, সাবধান!

কার এ সতর্কতা-বাণী! বিশুর দৃঢ় নিবদ্ধ ঠোঁটের বিচিত্র একটা হাসির সূক্ষ্ম আভাস দেখা দিল।

কপিঞ্জল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কোন অসুবিধা হচ্চে না ত?

বিশু উত্তর দিল, না। দিব্যি আরামই মনে হচ্ছে! সিন্দুকের উদরটি ত আর কম নয়—একটি ব্রহ্মাণ্ড! আমার মত একজন কেন দশজনেও এর এককোণ ভরাতে পারবে না!

গন্তব্য স্থান আমাদের বেশী দূরে নয়, মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। বন্ধুভাবে আমাদের কিন্তু এই শেষ দেখা। এর পর যখন আমরা মিলব—বোধ হয় শত্রুভাবেই।

বিশু জবাব দিল, সেটা আর আশ্চর্য্যের কি।

লরী চলিতে সুরু করিল।

বাহিরের কোন শব্দই আর স্পষ্টভাবে শোনা যাইতেছিল না। কপিঞ্জলের কণ্ঠস্বরও বিচিত্র একটা ভাবায় বিশুর কানে গিয়ে পৌঁছিতেছিল।

নিরুদ্দেশ যাত্রা! কে জানে কোথায় এর শেষ! বিশুর মনে হইল, পথের সন্ধানটা যদি কোন রকমে পাওয়া যাইত....

লরীটা এতক্ষণ সোজা রাস্তা ধরিয়াই চলিতেছিল, এবার বাঁকিল বাঁ দিকে....তারপর ডান দিকে....তার পর আবার বাঁদিকে....

তারপর মনে হইল লরীটা যেন পিছু হটিতেছে। কিন্তু তারপর কোন্ দিক ধরিল, বিশু বুঝিতে পারিল না, বুঝিতে আর চেষ্টাও করিল না।

মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিল, বা ওরা জানতে দিতে চায় না, মিছামিছি জানতে গিয়ে মাথাটা খারাপ করা বৈত নয়।

লরীটা আসিয়া থামিতেই মনে হইল, যেন সেটা উপরে উঠিতেছে এবং অনতিবিলম্বেই শূন্যে সবেগে দুলিতে লাগিল। ক্রেণ করিয়া তাকে যে উপরে তোলা হইতেছে, বিশুর বুঝিতে বাকী রহিল না। বুকের ভিতর তার ঢুপ্ ঢুপ্ করিতে লাগিল। কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে তাকে ?

সিন্দুকটা ভূমি স্পর্শ করিতেই শোনা গেল সমবেত কণ্ঠের উচ্চ জয়ধ্বনি : জয় ধনভাণ্ডারের জয়! জয় সাঙ্কো পাঞ্জার জয়!

সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া কে একজন বলিয়া উঠিল, এই যে উল্লাস, তুমিও ঠিক সময়ে এসে পড়েছ ? কিন্তু তোমার এত দেরী হল কেন কপিঞ্জল ?

সাঙ্কো পাঞ্জা! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এ সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠস্বর! বিশুর ইচ্ছা হইতেছিল, এই মুহূর্তে সে সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাঙ্কো পাঞ্জাকে এত কাছে সে কোনদিন পায় নাই, হয়ত জীবনে আর পাইবেও না।

কিন্তু মনের সে উত্তেজনা মনের ভিতরই চাপা দিয়া বিবেক কহিয়া উঠিল, না, না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মহাপাপে সে লিপ্ত হইবে না, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিবে না।

সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠ পুনরায় ধ্বনিত হইয়া উঠিল, উল্লাস, কপিঞ্জল, তোমরা আমার আদেশমত কাজ করেছ দেখে খুব খুসীই হয়েছি আমি! যে সিন্দুকটা তোমরা এনেছ...

চারিদিকেই আনন্দের একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল।

পূর্ব্ব কথারই জের টানিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা বলিয়া চলিল, পুলিশ চেয়েছিল আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে।

আনন্দের গুঞ্জন সহসা আক্রোশ ধ্বনিতে পরিণত হইল।

মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতা....

স্যাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় কহিতে লাগিল, আজ আমরা এই সিন্দুকের ধনরত্ন পরস্পর সমান ভাগে ভাগ করে নেব....

দুর্বৃত্তের দলটির আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার আর অন্ত রহিল না।

সকলকে থামাইয়া দিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা আবার কহিল, দাঁড়াও, তার আগে আরো দু'চারটে কথা বলবার আছে আমার। গত সপ্তাহে আমাদের যে সভা হয়েছিল, তাতে যা বলেছিলুম, আশা করি তোমাদের মনে আছে? আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালীর কথা নিশ্চয়ই তোমরা ভোল নি?

কি সে কার্য্য এবং তার প্রণালীই বা কিরূপ, বিশু কিছুই বুঝিল না। যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত, তা হইলে কখন সে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিত না।

বিশু জানিত, স্যাঙ্কো পাঞ্জার কথা বলার পদ্ধতিই এইরূপ। পাছে কিছু প্রকাশ হইয়া যায়, তজ্জন্য কোন কথাই সে স্পষ্ট বলে না, আকারে ইঙ্গিতে বুঝাইবার চেষ্টা করে।

স্যাঙ্কো পাঞ্জা তখনও থামে নাই। বলিতেছিল, তোমরা জান, এইমাত্র যে কাজটার কথা উল্লেখ করলুম, একদিকে যেমন সোজা, অন্যদিকে তেমনি ভয়ঙ্কর। এই কাজে সম্পূর্ণ সফলতার জন্যেই আজ আমাদের

প্রয়োজন পরস্পরের মধ্যে এই ধনরত্ন বিভাগ করে নেওয়া। নাও, এস···· না, দাঁড়াও। এই ধনরত্নের অংশ ছাড়াও কপিঞ্জলের আরো কিছু পাওনা আছে আমার কাছে, সেটা আগে শোধ করে দি। তোমরা সকলেই জান, একজন চোর এসেছিল আমাদের ওপর বাটপাড়ি করতে, কিন্তু কপিঞ্জলের চেষ্টায় তার সে উদ্যোগ আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে; শুধু ব্যর্থ ই হয়নি, সে পেয়েছে তার উপযুক্ত শাস্তি। কপিঞ্জল—একমাত্র কপিঞ্জলই রক্ষা করেছে আমাদের এই অগাধ ঐশ্বর্য্য। আমি ওকে দিচ্চি আমার অন্তরের ধন্যবাদ।

সমবেত সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভাই সব, যদিও জানি, অচ্ছেদ্য আমাদের বন্ধন, নিবিড় আমাদের সম্পর্ক, তবুও মাঝে মাঝে প্রতিজ্ঞার বাঁধনে না বাঁধলে হ'ত কোনদিন শিথিল হয়ে পড়বে। তোমরা আবার শপথ কর। আমি নরহন্তাই হই, বা সাধুপুরুষই হই, তোমরা নির্ব্বিচারে আমার আদেশ পালন করবে। আমিও শপথ করছি, আমাদের সকলেরই প্রয়োজনে যে কাজে আমি হস্তক্ষেপ করতে যাচ্চি, যদি আবশ্যক হয়, তাতে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব, দরকার হলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হবো না!

সাঙ্কো পাঞ্জা নিস্তব্ধ হইতেই তার অনুচরেরা একে একে সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল।

সিন্দুকের ভিতর বসিয়া বসিয়া বিশু বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। যে কাজ করিবার পূর্ব্বে এরূপ দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়, জানি না সে কাজ কত ভীষণ, কত নিষ্ঠুর!

শপথ-বাণী উচ্চারণ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ কে একজন বলিয়া উঠিল, আমি কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা করিতে রাজী নই।

দুর্বৃত্তের দল সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, খুন কর ওকে—খুন কর ওকে...

হাতের ইঙ্গিতে তাদের থামাইয়া দিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, জানতে পারি কি কপিঞ্জল, কেন তুমি এ প্রতিজ্ঞা করতে পার না?

কপিঞ্জল অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, না, সেটা আমার একান্ত নিজস্ব কারো কাছে প্রকাশের নয়।

কিন্তু তুমি আমার অনুচর। আমার অনুচরদের মধ্যে নিজস্ব বলে কোন কিছু থাকতে পারে না, তা বোধ হয় তুমি জানো?

জানি।

তবে হয় প্রতিজ্ঞা কর, নয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত না হয়েই কি সাঙ্কো পাঞ্জার দলে যোগ দিয়েছি? কিন্তু তুমি কি আমাকে হত্যা করতে সাহস করবে?

সাঙ্কো পাঞ্জা পিস্তলটা উদ্যত করিয়া বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, ভগবানের নাম কর কপিঞ্জল!

ধৈর্য্য রক্ষা করা বিশুর পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এবার নিশ্চয়ই কপিঞ্জলের মাথার খুলি উড়িয়া যাইবে! কিন্তু কেন সে প্রকাশ করিতেছে না, সিন্দুকটা খালি, তার ভিতর ধনরত্ন কিছুই নাই? তা হইলে ত এ অঘটনটা আর ঘটিতে পার না!

বিশু শপথ করিয়াছে, সাঙ্কো পাঞ্জার নিষ্ঠুর কবল হইতে সে নিরপরাধ লোকদের বাঁচাইবে। এই কি তার উপযুক্ত মুহূর্ত্ত নয়? সে যদি

সিন্দুকের ভিতর হইতে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে, তা হইলে দুর্বৃত্তের দল সিন্দুকটা শূন্য বুঝিয়া সাঙ্কো পাঞ্জাকে এক যোগে আক্রমণ করিবে এবং সেই অবসরে কপিঞ্জল করিবে পলায়ন। তারপর সে তার প্রতিশ্রুতি-মতই সাঙ্কো পাঞ্জার পাশে দাঁড়াইয়া তাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক হস্তে সে সিন্দুকের ডালাটা তুলিয়া ধরিয়া অন্যহস্তে পিস্তলটা উদ্যত করিয়া কহিল, সাবধান সাঙ্কো পাঞ্জা, সাবধান!

কপিঞ্জল দ্রুতপদে তার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সাঙ্কো পাঞ্জা তার একটি হাত উপর দিকে তুলিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত শোণিতে বিশুর বক্ষ প্লাবিয়া গেল, এবং সাঙ্কো পাঞ্জা বলিয়া বারেক চীৎকার করিয়াই, সে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল।

দশ

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতুল ব্রিজটার এক প্রান্তে আসিয়া রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের ভঙ্গী নির্বিকার হইলেও ভিতরে তার ঝড় বহিয়া চলিয়াছিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা পলাইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। পলাইয়াছে যখন, পলায়নের একটা সুচিন্তিত উপায়ও তখন সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সে উপায়টা কি ?

ধরা যাউক, নদীবক্ষেই তারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, তারপর সাঁতার দিয়া নির্বিঘ্নে করিয়াছে তীরে উত্তরণ। কিন্তু তারই বা সম্ভাবনা কোথায় ? প্রথমতঃ ঝাঁপ দিলে শব্দ একটা ত হইবেই ; দ্বিতীয়তঃ জলের জোয়ারে সাঁতার কাটিয়া পারে পৌঁছানো একরূপ অসম্ভব। সাঙ্কো পাঞ্জা হয়ত শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিতে পারে, কিন্তু সুজাতার পক্ষে তা কি সম্ভব ?

'প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কোন একটা ধারণা লইয়া কাজ করা প্রতুলের রীতি নয়। তাই স আবার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো মনে-মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, সুজাতা ও সাঙ্কো পাঞ্জার এই যে সাক্ষাৎ—দৈববশে হয় নাই, পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত হইয়া ছিল, তা হইলে এটাও মানিয়া লইতে হয় যে, গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে তারা এখানে আসে নাই। উদ্দেশ্য একটা ছিল নিশ্চয়ই। তারপর সাঙ্কো পাঞ্জা

যখন জানিতে পারিল, কেহ তার অনুসরণ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ সে একটা সঙ্কেত-ধ্বনি করিল—হয় তার অনুচরদের সাহায্য-প্রার্থনায়, নয় তাদের সজাগ করিবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সাহায্য প্রার্থনাই করিল যদি, তারা কেহ আসিল না কেন?

সম্ভব অসম্ভব কত কথাই যে তার মনে জাগিতে লাগিল, তার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই কি সব সময় মীমাংসার পথে পৌছানো যায়? সেখানে পৌছাইতে হইলে যুক্তি-তর্ক ছাড়া আরও যে কিছুর প্রয়োজন।

কথাটা মনে হইতেই মুখখানা তার আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আপন মনেই কহিল, হ্যাঁ, এটাই হবে প্রকৃত মীমাংসার পথ।

সাঙ্কো পাঞ্জা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে বিপন্ন, শীঘ্রই ধৃত হইতে পারে, তাই তার অনুচরদের সতর্ক করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সঙ্কেত-ধ্বনি করিয়াছিল এবং তারপরই সুজাতাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এই ঝম্প-প্রদানের ভিতর সাঁতার কাটিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইবার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না, ছিল শুধু আত্মরক্ষা করিবার আগ্রহ। নদীবক্ষে কোন নৌকার বন্দোবস্ত করিয়াছিল কি না—তাই বা কে বলিতে পারে?

অন্ধকারের মাঝেই দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া প্রতুল নদীবক্ষটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন দিকেই কিছুই দেখা গেল না।

অস্থির চরণে পদচারণা করিতে করিতে প্রতুলের হঠাৎ মনে হইল, ধারণার সত্যতা প্রমাণ করিতে হইলে ঘটনা-স্থলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর

নাই। কিন্তু এই শীতের রাত্রে নদীজলে সাঁতার কাটিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখা কি সম্ভবপর হইবে ?

কিন্তু অসম্ভব বলিয়া কোন কথা প্রতুলের অভিধানে ছিল না। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সে নদীতীরে নামিয়া আসিয়া জামা-কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল। পরিধানে রহিল শুধু অন্তর্বাসখানাই।

লক্ষ্য সর্পের মত চক্র তুলিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রতুল সেদিকে একবার দৃক্‌পাতও করিল না, জলে ঝাপাইয়া পড়িল।

কি তুহিন-শীতল হিমস্পর্শ তার। প্রতুলের মনে হইল, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতই সর্বাঙ্গ তার অসাড় হইয়া গেছে, সাঁতার কাটিবার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নাই।

কোন রকমে ভাসিয়া থাকিয়া জলের শৈত্যটা সে সহ্য করিয়া লইল বটে, কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু জীবনে সে কোনদিন কোন কাজ অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া পরিত্যাগ করে নাই। প্রাণপণ চেষ্টায় স্রোতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু কোথায় সাঙ্কো পাঞ্জা ? যার জন্য জীবন তুচ্ছ করিয়া সে নদীজলে ঝাপাইয়া পড়িল, তার সন্ধান বুঝি মিলিল না।

আর একবার ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইবার জন্য মাথাটা সে উপর দিকে তুলিল। দেখা গেল, ব্রিজের তলদেশ হইতে মোটা কাছি একটা জলের উপর নামিয়া আসিয়াছে। এর সাহায্যে যে সাঙ্কো পাঞ্জা সুজাতাকে লইয়া নিচে নামিয়াছে, বুঝিতে তার আর বাকী রহিল না। এখানে নিশ্চয়ই একটা নৌকা তার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

অনুসন্ধান আর বৃথা ভাবিয়া প্রতুল কাছিটা ধরিয়াই উপরে উঠিবার সংকল্প করিল।

কাছিটার দূরত্বও তখন বড় অল্প ছিল না। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সে সাঁতার কাটিতে লাগিল।

খানিক দূর অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ মনে হইল, ডান পাটা যেন তার কিসে আটকাইয়া গেছে। স্রোতোমুখে হয়ত কোন লতা গাছ বা দড়ির টুকরা ভাসিয়া আসিতেছিল, জড়াইয়া সে পাটা একবার ঝাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তে বাম পাটাও গেল আটকাইয়া।

পিছন ফিরিয়া তাকাইতে দেখিল, জলের ভিতর হইতে দুটা হাত ভাসিয়া উঠিয়া তার পা দুটা সবলে চাপিয়া ধরিয়াছে।

তারপরই প্রবল আকর্ষণ। প্রতুল জলের ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বাধা দিবে কি, এমনিই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল সে, আততায়ীর বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি উত্তোলনেরও ক্ষমতা তার ছিল না।

আর কতটুকু! বড় জোর দু'চার মিনিট···তারপরই ব্যস্, চিরদিনের জন্য তাকে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রতুল একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল আততায়ীকে সে চিনিতে পারে কিনা····

কিন্তু চিনিতে পারা দূরে থাক্, মাথা তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া কোন রকমে একবার দেখিতেও সমর্থ হইল না। পরক্ষণেই তার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

এগারো

বহুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়া পাইয়া বিশু চোখ মেলিয়া তাকাইল, কিন্তু সে যে কোথায়, কিছুই বুঝিল না। দেহ নিস্তেজ, অবসন্ন; বুকে নিদারুণ বেদনা; চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট!

সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে সে যে বন্দী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। আগাগোড়া ঘটনাটা তার একটা দুঃস্বপ্নের মতই মনে হইল।

বিশু প্রথমেই জানিতে চেষ্টা করিল, সে কোথায় এবং কি ভাবে আছে। হাতের স্পর্শে বুঝিতে পারিল, চতুর্দ্দিকে তার লোহার প্রাচীর এবং প্রাচীরটা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার এতটুকু ঠাঁই নাই ছাদটা এত নীচু যে মাথায় ঠেকে। এক কথায় বলিতে গেলে তার কারাকক্ষটিকে একটা মোটা লোহার পাইপ বা সিলিণ্ডার বলা চলে।

কক্ষটী আবার স্থির ছিল না বিশুর মনে হইতেছিল, সর্ব্বদাই যেন সেটা উপরে নিচে উঠা-নামা করিতেছে; আবার কখন বা এপাশে ওপাশে কাত হইয়া পড়িতেছে।

চারিদিকে প্রগাঢ় স্তব্ধতা। বিশু কান পাতিয়া বাহিরের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে তার কক্ষটী যে কোন একটা জিনিষের সহিত ঘর্ষিত হইতেছে, স্পষ্টই বোঝা গেল।

বিশু জানিত, অতীতের ঘটনাগুলো পর পর আলোচনা করিয়া

দেখিলে বর্ত্তমান অবস্থার কারণ বুঝিতে এতটুকু কষ্ট হয় না। তাই সে চেষ্টা করিল, আগাগোড়া ঘটনাটা একবার স্মরণ করিয়া দেখিতে। প্রথমেই তার মনে পড়িল, কপিঞ্জলের সহিত কথাবার্ত্তা, তারপর সিন্দুকটার ভিতর তার বন্দাবস্থা। সাঙ্কো পাঞ্জার দুর্ব্যবহারে উত্তেজিত হইয়াই সে সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তার আকস্মিক আবির্ভাবে সাঙ্কো পাঞ্জা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া তাকে করিল গুলি। কপিঞ্জল ছুটিয়া আসিয়া তার সম্মুখে দাঁড়াইল বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিল না। গুলি আসিয়া তার বক্ষ ভেদ করিল।

গুলি আসিয়া বক্ষ ভেদই করিল যদি, সে এখনও বাঁচিয়া আছে কিরূপে? ব্যাপারটা আগাগোড়াই অদ্ভুত।

বেদনার স্থানটা অনুভব করিতেই বিশু বুঝিতে পারিল তার পকেট-বইটাই রক্ষা করিয়াছে তাকে। মলাটটার ভিতর দিয়া গুলি বক্ষ ভেদ করিতে পারে নাই, তার আঘাতেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এই মূর্চ্ছাটাকেই কি সাঙ্কো পাঞ্জা ভাবিয়া লইল মৃত্যু? মৃত ভাবিয়াই সে তাকে এই কফিনে আবদ্ধ করিয়াছে?

কপিঞ্জল তাকে রক্ষা করিতেই অগ্রসর হইল যদি, কোথায় গেল সে? সাঙ্কো পাঞ্জা কি তাকে হত্যাই করিয়াছে?

কক্ষটার ভিতর না ছিল আলো, না ছিল বাতাস শ্বাস গ্রহণের জন্য বিশুকে রীতিমত হাঁফাইতে হইতেছিল।

আর কিছুক্ষণ যদি তাকে এভাবেই থাকিতে হয়, মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী কোন সন্দেহই ছিল না।

কক্ষটী দুলিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও লৌহ প্রাচীর গাত্রে অবিরাম ঘর্ষিত হইতেছিল। সুতীব্র-যাতনা!....

সহসা বিজয় মনে হইল, সে কি কোন জাহাজের ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে? কিন্তু জাহাজের আরোহীর সহিত নিজেকে তুলনা করিতেই তার সম্ভাবনাটাও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

রুদ্ধ বায়ু মুক্তির পথ না পাইয়া, ক্রমশঃই তার কণ্ঠনালি চাপিয়া ধরিতেছিল।

আর কতক্ষণ?

মরণের ভয় কোনদিনই সে করে নাই। যেটা নিশ্চয়ই একদিন আসিবে স্বাভাবিকভাবেই আসুক অথবা সাকো পাঞ্জাই তার উপলক্ষ্য হোক্, তাকে ভয় করিয়া লাভ?

কিন্তু একটা কথা—সেই কথাটাই অবিরাম তার বুকের ভিতর খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। পরাজয়ের ব্যর্থতা লইয়া সাকো পাঞ্জার হাতেই মরিতে হইল তাকে?

প্রতুল এখন কোথায়? জীবন প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে একবার কি তাঁর সহিত দেখা হইবে না? হায়রে দুরাশা!

কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিল। মুক্তির সম্ভাবনা কি তার সত্যই নাই?

হঠাৎ মন যেন বলিয়া উঠিল, আছে, নিশ্চয়ই আছে এমন কত বারই ত মৃত্যুর হাত হইতে আশ্চর্য্য উপায়ে সে রক্ষা পাইয়াছে।

কক্ষটী তখনও সেই ভাবে দুলিতেছিল, ঘুরিতেছিল, কাত হইয়া

পড়িতেছিল। একটানা একঘেয়ে শব্দ!...হঠাৎ বিশুর মনে হইল, বাহির হইতে যেন একটা নূতন শব্দ আসিতেছে।

কান পাতিয়া বিশু শুনিল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক যেন উখা ঘষার শব্দ। উখা দিয়া ঘষিয়া নিশ্চয়ই কেহ লৌহদ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে। আনন্দের আতিশয্যে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, একটু তাড়াতাড়ি বন্ধু, একটু তাড়াতাড়ি...

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হইল, বিকারগ্রস্ত রোগীর মত সে ভুল বকিতেছে না ত?

লৌহকক্ষের ভীষণতার কথা স্মরণ করিয়া কিছুতেই তার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না, এবার সে কোনমতে মুক্তি পাইবে। নিশ্চয়ই সে ভুল শুনিয়াছে।

শব্দটা আরও যেন স্পষ্ট বলিয়া বোধ হইল। উখাটা নিশ্চয়ই লৌহ-গাত্র ভেদ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

পরক্ষণেই সন্দেহ আসিয়া মনে উদিত হইল, সত্যই কি ওটা উখা ঘষার শব্দ? তাই যদি হয়, তার সহিত মুক্তির কি সম্বন্ধ?

কোন সম্বন্ধই হয়ত নাই, অন্য কোন প্রয়োজনে কেহ হয়ত উখা ঘষিতেছে, মুক্তি-পিপাসু বিশুর মন দেখিতেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন!

এই স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই জীবনের যে শেষ হইয়া যাইবে, বিশুর আর সন্দেহ রহিল না। ধীরে ধীরে সে চোখ মুদিল। কানের ভিতর দিয়া, নাকের ভিতর দিয়া তার রক্ত ক্ষরিয়া পড়িতে লাগিল।

বারো

জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াই প্রতুলের মনে হইল, কি দুর্নিবার আকর্ষণেই না আততায়ী তাকে জলের ভিতর টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল। তাই জলে নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ সন্তরণকারীরা যেমন এক নিঃশ্বাসে অনেকটা বায়ু টানিয়া লইয়া শরীরের ভিতর সঞ্চিত করিয়া রাখে, সেও তেমনি করিয়াছিল। কিন্তু জলে ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ী মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত করে, সেই আঘাতেই তার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। তারপর যখন তার চেতনা সঞ্চার হয়, সে বুঝিতে পারে, জলের ভিতরই আছাড় মারিয়া তাকে কোন একটা স্থানে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে আসিবার পর হইতে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের আর কোন কষ্টই হইতেছিল না। মনে হইতেছিল যেন সে মুক্ত স্থানেই আছে।

প্রতুল অনুভব করিয়া বুঝিল, মুক্ত স্থান সেটা নয়, একটা মোটা লোহার পাইপের ভিতর তাকে রাখা হইয়াছে।

অপর কেহ হইলে হয়ত এ অবস্থায় উঠিয়া বসিত বা মুক্তিলাভের চেষ্টা করিত, কিন্তু প্রতুল তার কিছুই করিল না না। চোখ মুদিয়া যেমন নিশ্চলভাবে সে শুইয়াছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল। হঠাৎ কেহ দেখিলে বুঝিতেই পারিবে না, সে জীবিত কিংবা মৃত। নাসিকা দিয়া সে নিঃশ্বাস লইতেছিল বটে, কিন্তু ত্যাগ করিবার সময় ঠোঁটটা অতি সাবধানে ঈষৎ ফাঁক করিতেছিল-মাত্র।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রতুলের মুখ-চোখের দীপ্তি প্রখর হইয়া উঠিল।

একজন প্রশ্ন করিল, লাহিড়ী মরেছে?

উত্তরে কে একজন বলিল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

প্রশ্নকারী বজ্র কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, অপদার্থ! একটা লোক মরেছে কি বেঁচে আছে, তাও বুঝতে পার না?

লোকটি পুনরায় উত্তর দিল, মানে নিঃশ্বেসটা ঠিক পড়ছে কি না—মোটেই বোঝা যাচ্চে না।

প্রশ্নকারী আদেশের সুরে কহিল, যাও, তবে তাকে তিন নম্বর কুঠরীতে গিয়ে রেখে এস। সামান্য একটা টিকটিকিকে নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে চাই না আমি, হাতে আমার অনেক দরকারী কাজ আছে। সুনন্দার খোঁজে বেরুতে হবে এখুনি।

কণ্ঠস্বর যে সাঙ্কো পাঞ্জার—বুঝিতে প্রতুলের মোটেই বিলম্ব হইল না এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিল; সে তার অতি নিকটেই আছে। মনে জাগিল প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা। কিন্তু হায়রে! কোন উপায়ই ছিল না তখন।

প্রতুল ভাবিল, তার উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন সে চোখ মুদিয়াই থাকিবে; তার জ্ঞান হইয়াছে বলিয়া আততায়ী যেন বুঝিতে না পারে।

সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশানুযায়ী দুটি লোক আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাকে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

প্রতুল আপন মনেই বলিতে লাগিল, কোথা থেকে আমায় কোথায়

নিয়ে এল এরা? ছিলাম জলের তলায়, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল, নিয়ে এল এমন জায়গায়, যেখানে বইছে মুক্ত বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের আর কোন অসুবিধাই নেই। অথচ জলের ওপর এনেছে বলেও ত মনে হচ্ছে না। কিন্তু উঃ...

প্রতুলের মনে হইল, তার দেহের অস্থিগুলা পর্য্যন্ত যেন এক সঙ্গে চুরমার হইয়া গেল।

নিষ্করুণ বাহক দুটা এই সময় তাকে সজোরে মাটীর উপর ফেলিয়া গড়াইয়া দিল।

প্রতুল আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করিল না, কারণ তাতে ফল হইবে বিপরীত।

পরক্ষণেই দরজা বন্ধ করিবার শব্দ তার কানে আসিল। শিকলের পরিবর্ত্তে দরজায় যে স্ক্রু ও বল্টু আঁটিয়া দেওয়া হইল, তাও তার বুঝিতে বাকী রহিল না।

এতক্ষণ পরে একাকী সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলিতে পাইয়া প্রতুল মনে মনে স্বস্তি অনুভব করিল।

এবার তার চিন্তা করিবার সময় আসিল—কোথায় আছে সে? কোন জাহাজে নয় নিশ্চয়ই, জাহাজ জলে ভাসে। তবে....হ্যাঁ,.ডুবো জাহাজ হইতে পারে। সাঙ্কো পাঞ্জার পক্ষে তার হতভাগ্য বন্দীদের জন্য এক-খানা ডুবো জাহাজ সংগ্রহ করা বিচিত্র নয়। এখানেই সে সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ পুলিশ কোনদিনই ইহার সন্ধান পাইবে না। আইনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহাই তার চরম এবং পরম উপায়।

মুক্তির একটা উপায় নির্দ্ধারণের জন্য প্রতুল এবার সচেষ্ট হইয়া

উঠিল। সাঙ্কো পাঞ্জার গুপ্ত কারাকক্ষে সে যখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন ইহারও বিশদ বিবরণ তার জানা আবশ্যক। আর হয়ত কোনদিন সে এখানে আসিবার সুযোগ পাইবে না।

মনে মনে সে বলিল, এবার আমি বুঝতে পেরেছি। ক্রমশঃ সবটাই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে। সুজাতা ও সাঙ্কো পাঞ্জা সন্দেহ করেছিল যে, আমি তাদের অনুসরণ করছি। তাই সাধারণতঃ তারা যে ভাবে গুপ্তগৃহে প্রবেশ করে, সেটা আমি যাতে জানতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে তারা ব্রিজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সেখানে যেতে সঙ্কেত-ধ্বনি করে সে তার অনুচরদের সাবধান করে দেয় দেয় এবং প্রস্তুত থাকতে বলে। তারপর রাত্রির অন্ধকার আর কুয়াশার সুযোগ নিয়ে তারা ব্রিজের ধারে গিয়ে দড়িটা বেয়ে নিচে নেমে আসে। দড়িটা যে আগে থেকেই সেখানে ঝুলছিল, তাতে আর কোন সন্দেহই নেই। নৌকা বা গুপ্ত জলযানের ব্যবস্থাও ছিল সেখানে। সাঙ্কো পাঞ্জার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

কতক্ষণ সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে তার মুখে ফুটিয়া উঠিল মৃদু হাসি।

সাঙ্কো পাঞ্জার এই নির্য্যাতনে লোকসানের চেয়ে তার লাভই হইয়াছে বেশি। এইভাবে বন্দী করিবার ফলে আজ সে যার সন্ধান পাইয়াছে, জীবনে হয়ত কোনদিন শত চেষ্টা করিয়াও ইহার সন্ধান মিলিত না।

বিপদকে কোনদিন প্রতুল বিপদ বলিয়া বরণ করিয়া লয় নাই, আজও তার সেইজন্য মনে হইল এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ।

সুযোগকে কোনদিনই সে অবহেলা করিতে শিখে নাই, আজও করিল না।

তার হস্তপদ যে আবদ্ধ করা হয় নাই, প্রতুল ভাবিল, তার দুইটা কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ—সাঙ্কো পাঞ্জার দৃঢ় বিশ্বাস, এখান হইতে পলায়ন অসম্ভব। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে এই—তাকে মৃত ভাবিয়া বাঁধিবার কোন প্রয়োজনই তারা বোধ করে নাই।

পায়ের ও হাতের উপর জোর দিয়া ধীরে ধীরে প্রতুল পাইপটার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ছোট একটা ঘর—দৈর্ঘ্য হাত দশেক, প্রস্থে ছয় হাতের বেশি নয়। ছাদটা এত নিচু যে মাথায় ঠেকে। ঘরটার দেওয়াল, মেঝে, ছাদ—সবই লৌহ-নির্ম্মিত।

চারিদিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া প্রতুল অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, যা দিয়েই তৈরী হোক্ ঘরটা, যায় আসে না কিছু। আগে আমার জানা দরকার সাঙ্কো পাঞ্জা এখন আছে কি না এখানে....

পর মুহূর্ত্তেই তার মনে পড়িয়া গেল সাঙ্কো পাঞ্জার উক্তি। ক্ষণপূর্ব্বেই বলিয়াছে, এখনই সে সুনন্দার খোঁজে যাইবে। সুতরাং সাঙ্কো পাঞ্জা যে এতক্ষণ জলযান ত্যাগ করিয়া গেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ফিরিবে কখন? সে সংবাদটা জানিতে পারিলে তার কত না সুবিধাই হইত। ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয়ই সে একবার প্রতুলের খোঁজ করিবে।

করুক, ক্ষতি নাই। তার আগেই সে তার অভীপ্সিত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিতে পারিবে।

প্রতুল কাজ সুরু করিল।

জামা কাপড় ছাড়িয়া জলে নামিবার পূর্ব্বে সে তার গলার মাফলারটা কোমরে জড়াইয়া লইয়াছিল। কোমর হইতে সেটা খুলিতে খুলিতে আপন মনেই বলিল, আত্মরক্ষার জন্যে এর চেয়ে বেশি সাবধানতা কি আর অবলম্বন করা যেতে পারত? এরা আমাকে মৃত মনে করে দেহটা অনুসন্ধান করে দেখেনি, তাই। দেখলে এগুলো কখনই আমার কাছে রাখত না।...কিন্তু দেখলেই কি বুঝতে পারত? যত বড় চতুর, যত বড় ধূর্ত্তই হোক্ সাঙ্কো পাঞ্জা, এর বিশেষত্ব কিছুতেই সে ধরতে পারত না।

মাফলারের ভিতর ছিল কতগুলা ক্ষুদ্র লোহার কৌটা। আকারে হয়ত একটা বোতামের চেয়ে বড় নয়। প্রতুল সেগুলা এক একটা করিয়া গুণিয়া তুলিতে তুলিতে বলিল, যতটা উপাদান আছে এর ভেতর, আকাশ-প্রমাণ একটা বাড়ী মুহূর্ত্তের ভেতর ধূলিসাৎ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার এই কারাকক্ষের ক্ষুদ্র লৌহদ্বার—এর অস্তিত্ব আর কতটুকু?

কৌটার ভিতর বাদামী রংয়ের একপ্রকার চূর্ণ ছিল। একে একে সেগুলা এক সঙ্গে জড়ো করিয়া, মিশাইয়া লইয়া প্রতুল দরজাটির সামনে রাখিয়া দিল। মৃদু হাসিয়া কহিল, ভীষণ বিস্ফোরণের সর্ব্বশেষ আবিষ্কার! সারা পৃথিবীটার উচ্ছেদ সাধন করা যায়! সাঙ্কো পাঞ্জার অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষা করতে এটাই আমার অমোঘ অস্ত্র...

হঠাৎ মনে পড়িল বিশুর কথা—তার অভিন্নহৃদয় বিশু, তার সহোদরাধিক বিশু...কোথায় যে সে, কে জানে? হয়ত কৌশলী সাঙ্কো পাঞ্জার

পাতা ফাঁদে পা দিয়া তার জীবনও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে।

সাঙ্কো পাঞ্জার সহিত সমরে পতন হইলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একমাত্র বিশুই হইবে তার উত্তরাধিকারী। সেই বিশু যদি আজ সত্যই...

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হইল, যে কার্য্যে ব্রতী হইয়া তারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সেই কার্য্যে মরণই যদি হয় অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য দুঃখ করিবার কি আছে?

আসুক সাঙ্কো পাঞ্জা, সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মরুক বিশু, ক্ষতি নাই; মরুক প্রতুল, দুঃখ করিবার কেহই থাকিবে না।

হঠাৎ তার কানে ভাসিয়া আসিল কার যেন মৃদু কণ্ঠস্বর। প্রতুল উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রতুলবাবু—প্রতুল...কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

সাড়া দিবার পূর্ব্বে প্রতুল ভাবিতে লাগিল।

আবার সেই করুণ কণ্ঠ: আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্চেন না, প্রতুলবাবু?

প্রতুল ভাবিতে লাগিল, আমি জীবিত কি মৃত জানিবার জন্য সাঙ্কো পাঞ্জার একটা ফন্দী নয় ত?

কিন্তু আবার সেই কম্পিত কণ্ঠ কানে আসিয়া বাজিল, আমার কথার জবাব কি আপনি দেবেন না প্রতুলবাবু? দয়া করে একটী বার সাড়া দিন।

কণ্ঠস্বরে তার কি ছিল জানি না, প্রতুলের বুকখানা যেন ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

কার স্বর? প্রতুল নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, সুনন্দার? সুনন্দা কি তারই মত বন্দী হইয়া রহিয়াছে?

প্রতুল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সহানুভূতির স্বরে কহিল, কে আপনি জানতে পারি কি?

আমি—আমি সুজাতা।

তেরো

সুজাতা! মুহূর্তেই প্রতুলের সমস্ত চিত্ত এই মেয়েটির বিরুদ্ধে নিবিড় ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। কথাটা যেন সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, এমনই ভাবে কহিল, কি বললেন? সুজাতা? সুজাতা দেবী? সাঙ্কো পাঞ্জার সহধর্মিণী সুজাতা দেবী? কোন সাহসে আপনি...

কথার মাঝখানেই ব্যাকুল কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, বিশ্বাস করুন প্রতুল বাবু, আমি শপথ করে বলছি, আপনার এই বন্দীত্বের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নেই। এখনও আপনাকে রক্ষা করার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, হাসিমুখে আমি জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারি।

বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে প্রতুল কহিল, ধন্যবাদ! কিন্তু এই সৎসাহসের পরিবর্ত্তে আমি যে আপনার অনুসরণ করছিলুম, এ খবরটা ত সাঙ্কো পাঞ্জাকে না দিলেই পারতেন?

সত্যি বলছি, ও খবর আমি দিইনি, প্রতুলবাবু! অতক্ষণ কোথায় ছিলুম জিজ্ঞাসা করতে আমি শুধু তাকে বলেছিলুম, গেছলুম প্রতুল বাবুর কাছে, তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে। পাছে আপনি আমার অনুসরণ করেন, সেইজন্যে আপনাকে বন্দী করে রেখে এসেছি—একথাও তাকে বলেছিলুম, কিন্তু সে কিছুতেই বিশ্বাস করলে না।

প্রতুল হাসিল। সে হাসি সুজাতা দেখিতে পাইল না, পাইলে হয়ত বুঝিত, তার এই অশ্রু-সজল ব্যাকুলতা প্রতুলের বুকে একটা দাগও

কাটিতে পারিতেছে না। ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া সে কহিল, অতীতের কথা নিয়ে মিছে তর্ক করে আর লাভ নেই। এখন বর্ত্তমান নিয়েই আলোচনা করা যাক্। কি বলতে চান আপনি?

সুজাতা ঢোক গিলিয়া কহিল, ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক—আপনার পক্ষে মর্ম্মান্তিকও।

কিন্তু শুনে আমার লাভ নেই, কারণ এ অবস্থায় আমি তার কোন প্রতিকারই করতে পারব না।

প্রতিকার করতে আপনি পারবেন না ত পারবে কে?

এই মেয়েটিকে এতদিনেও প্রতুল চিনিতে পারিল না। ও যে কি বলিতে চায়, আর কি করিতে চায়, তা যেমনি জটিল, তেমনি দুর্ব্বোধ্য। প্রতুলের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ওর বিশ্বাস কতখানি এবং সাঙ্কো পাঞ্জাকেই বা ও কতটুকু বিশ্বাস করে....

তাকে স্তব্ধ থাকিতে দেখিয়া সুজাতা পুনরায় কহিল, শুনুন প্রতুল বাবু! আজ রাত্রে বিশু 'তাকে' আক্রমণ করেছিল।

হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া প্রতুল প্রশ্ন করিল বিশু আক্রমণ করেছিল সাঙ্কো পাঞ্জাকে? কোথায়?

অনুচরদের নিয়ে গুপ্ত একটা সভায় যখন সে বক্তৃতা দিচ্ছিল, তখন বিশু হঠাৎ কোত্থেকে বেরিয়ে....

কোত্থেকে বেরিয়ে মানে? কোথায় ছিল সে? সভার কথা পূর্ব্বাহ্নেই জানতে পেরে কোথাও কি ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল?

তা আমি ঠিক বলতে পারি না!

ওঃ! কি দুঃসাহসী ছেলে? তারপর?

তারপর আর আমি কিছুই জানি না প্রতুলবাবু! তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিন্তু কোন কথাই সে বলতে রাজী হল না।

সুজাতার দিকে তখন আর প্রতুলের মন ছিল না। তাই তার কথাগুলা কানে গেলেও অন্তরে প্রবেশ করিল না। সে তখন ভাবিতেছিল তার সেই দুঃসাহসী বন্ধুটির কথা—হয়ত একাকী অসহায় অবস্থায় সে দস্যু-সম্রাটের হস্তে পড়িয়াছে....লাঞ্ছনার আর অন্ত নাই....

সুজাতা বলিয়া চলিল, আপনি জানেন না প্রতুলবাবু, কি রকম রেগে গেছে সে। রাগটা তার প্রধানতঃ সুনন্দারই ওপর। বাপের ধনরত্ন চুরি করে নিয়ে সে পালাচ্ছিল। আপনি বন্দী করেছিলেন তাকেই, বিশু মুক্ত করে দিয়েছিল তাকেই। কিন্তু সে জানে, সুনন্দা এখনও পুলিশের হাতেই বন্দী হয়ে আছে। তাই সে প্রতিজ্ঞা করেছে, পুলিশ যদি তাকে মুক্ত করে না দেয়, সে তার প্রতিশোধ নেবে।

সুজাতা দম লইয়া পুনরায় সুরু করিল, প্রতিশোধ মানে সমস্ত সহরবাসীর ওপর অন্যায় অযথা অত্যাচার! হাজার হাজার লোক হবে আহত, হাজার হাজার লোক হবে মৃত্যুমুখে পতিত। আপনি হয়ত জানেন না প্রতুলবাবু, সে ইচ্ছা করলে এখান থেকে—মানে—যেখানে আমরা বসে আছি, সেখান থেকে বিষবাষ্পে সমস্ত শহর ভরিয়ে দিতে পারে। আপনি কি ধারণা করতে পারেন কি ভীষণ সে অত্যাচারের রূপ!

একটু স্তব্ধতা—জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুজাতা আবার আরম্ভ করিল, যা করেই হোক্, সে তার আদরিণী মেয়েকে পুলিশের হাত থেকে মুক্ত করতে চায়। আমাকে আপনি এইটুকু দয়া করুন প্রতুলবাবু, সুনন্দা কোথায় আছে, তা যদি জানা থাকে আপনার, আপনি বলুন, আমি

তার মেয়ের সন্ধান বলে দিই, নিরপরাধ শহরবাসীরা তার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচুক। আপনার একটা কথার ওপর নির্ভর করছে আজ সমস্ত শহরবাসীর নিরাপত্তা। বলুন, বলুন প্রতুলবাবু... "

দেখুন সুজাতা দেবী, প্রতুল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, তিনটি কারণে আমি আপনাকে কোন কথাই বলব না। জবাব না দেওয়ার অবিশ্যি প্রথম কারণটাই যথেষ্ট, তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কারণটাও কম মূল্যবান নয়। প্রথমতঃ আমি বলব না, তার কারণ আমি জানি না সুনন্দা কোথায় আছে। দ্বিতীয়তঃ আমি বলব না, তার কারণ আমি জানি সাঙ্কো পাঞ্জা আপনার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, তারই কথামত আপনি আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন। আর তৃতীয়তঃ আমার না বলার কারণ, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কোন লোকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার বা মতামত প্রকাশ করবার ক্ষমতা আছে, সুতরাং সেটা আমারও থাকা স্বাভাবিক...

চোখের জলের ভিতর দিয়া সুজাতার কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হইয়া আসিল, আমি স্বীকার করছি প্রতুলবাবু, আপনাকে মুক্ত করে দেবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই, যদি থাকত তা হলে অন্ততঃ হয়ত আপনাকে এটাও বিশ্বাস করাতে পারতুম....

কথা তার শেষ হইল না; প্রতুল চীৎকার করিয়া উঠিল, আর মুহূর্ত্ত মাত্র....

অন্য একটা কৌটা হইতে খানিকটা গুঁড়া বাহির করিয়া দরজার সম্মুখে রক্ষিত গুঁড়ার উপর ছড়াইয়া দিয়া সে খুসী মুখে কহিয়া উঠিল, পৃথিবীতে যত রকম বিস্ফোরকের সৃষ্টি হয়েছে, আমার মনে হয় এত অল্পে এতখানি কাজ করতে আর কিছুতেই পারে না।

গুঁড়ার উপর হইতে প্রথমে উঠিল ক্ষীণ একটা ধূম্রেখা এবং তার পরই....

বিস্ফোরণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতুলের কানে আসিল বিকট একটা শব্দ, চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল এক ঝলক অগ্নিশিখা। পরক্ষণেই মনে হইল, কোন একটা অশরীরী শক্তি যেন তার দেহটাকে লইয়া জলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। বাহিরের অনুভূতিটা ফিরিয়া আসিতেই বুঝিতে পারিল, নদীজলে সে সাঁতার কাটিতেছে।

বিস্ফোরণ কি ভাবে হইয়াছিল, তার জীবনটাই বা রক্ষা পাইল কি প্রকারে—ভাবিবার সময় তখন ছিল না। সে শুধু ভাবিতেছিল, বিস্ফোরণে ধ্বংস হইয়াছে কতটুকু? শুধু তার কক্ষটাই, না জাহাজের সমস্ত টুকুই? সাঙ্কো পাঞ্জা কোথায় গেল? সুজাতা বা গেল কোথায়?

ভাবিতে ভাবিতেই সে তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ পায়ে ঠেকিল ভারীগত কি একটা বস্তু।

ঘাড় তুলিয়া তাকাইতেই সে দেখিল, জলে ভাসিতেছে একটি নরদেহ—তারই স্বেচ্ছাকৃত বিস্ফোরণে আহত কোন হতভাগ্য। হঠাৎ প্রতুলের মনে হইল, সাঙ্কো পাঞ্জা নয় ত?

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা যে নয়, সাঁতার দিয়া কাছে আসিতেই সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। দেহের প্রায় সবটাই জলে নিমজ্জিত থাকিলেও স্রোতে ভাসিতেছিল এক রাশ চুল ও পরিহিত সাড়ীর একটা প্রান্ত।

সুজাতা যে—কোন সন্দেহই আর রহিল না। সমবেদনায় প্রতুলের বুক ভরিয়া উঠিল। শক্তির প্রতিটি বিন্দু সে নিয়োগ করিল ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই রমণীটির উদ্ধারে!

১ তীরে আসিয়া যখন সে পৌঁছিল, নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদে তার দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু বিশ্রামের সময় সেটা নয়। তাই সে দেহটাকে তার জোর করিয়া একবার নাড়িয়া লইয়া সুজাতার পাশে হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া পড়িল—তার নাড়ীটা পরীক্ষা করিবার জন্য। যাকে সে মনে করিয়াছিল মৃত, দেখিল সে মৃত নয়, মূর্চ্ছিত।

জীবন রক্ষা করিতে হইলে সুজাতার যে সাহায্যের প্রয়োজন, প্রতুল বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই সেই অবস্থায় তাকে শোয়াইয়া রাখিয়া সে লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইল।

নদীতীর অতিক্রম করিয়া কখন সে যে পথের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে, খেয়াল ছিল না। পথচারী একজন তার হাতে একটা পয়সা দিতেই লইয়া তার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। শুষ্ক অন্তর্ব্বাস-পরিহিত কর্দ্দমযুক্ত দেহটার দিকে চাহিলে সত্যই মনে করুণার উদ্রেক হয়!

আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয় বিবেচনা করিয়া প্রতুল সুজাতার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু কোথায় সুজাতা?

জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেও সেই অবস্থায় পলায়ন যে একজন নারীর পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, প্রতুল ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু তবু অবিশ্বাস করিবার কোন উপায় ছিল না, নদীতীরের পদরেখাগুলি তার সত্যতা প্রমাণ করিয়া দিতেছিল।

অগত্যা সেই পদচিহ্ন ধরিয়াই প্রতুল অগ্রসর হইবে বলিয়া স্থির করিল।

বেশি দূর যাইতে হইল না, দেখা গেল অদূরেই সুজাতা কোন রকমে তার কম্পিত দুর্বল পা দু'খানা টানিয়া লইয়া টলিতে টলিতে ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতুল ভাবিল, সে যে নদীগর্ভ হইতে তাকে উদ্ধার করিয়াছে, এ খবর সুজাতা রাখে নাই। মনে করিয়াছে, স্রোতমুখে ভাসিতে ভাসিতে নিশ্চয়ই সে তীরে আসিয়া আটকাইয়াছে। নৈলে শুষ্ক একটা ধন্যবাদ দিবার জন্যও হয়ত সে অপেক্ষা করিত।

কিন্তু পরক্ষণেই বিপরীত একটা যুক্তি আসিয়া তার মস্তিষ্ক অধিকার করিল। সুজাতা এত নির্বোধ নয় যে, ভাবিবে, স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কেহ আসিয়া তীরে আটকায়; আটকাইলেও নদীজল হইতে অন্ততঃ দশ-বারো হাত দূরে তীরের উপর শুইয়া থাকে [illegible] সে মনে করিয়াছে, উদ্ধার করিয়াছে তাকে হয়ত কোন এক অপরিচিত [illegible]

কিন্তু সে যাইতেছে কোথায়? সাঙ্কো পাঞ্জার [illegible] [illegible] সময় হয়ত সে উপস্থিত ছিল না, তাকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনাটার কথা জানাইবার জন্য তারই খোঁজ করিতেছে সে!

যেখানেই যাক্, প্রতুল স্থির করিল, সুজাতার অনুসরণ করিবে। কিন্তু সে যে আর চলিতে পারিতেছে না!

অতি কষ্টে ব্রিজের উপর উঠিয়া সুজাতা রেলিংটার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল—হয়ত বিশ্রামের আশায়। প্রতুল দাঁড়াইয়া ঠিক তার বিপরীত দিকে আলোক-স্তম্ভটার পিছনে।

ব্রিজের উপর হইতে গঙ্গাতীরে দৃষ্টি পড়িতেই প্রতুল দেখিতে পাইল, তার জামা-কাপড়গুলা তখনও সেখানে পড়িয়া আছে। মনে হইল,

একবার ছুটিয়া গিয়া সেগুলা পরিয়া আসে। কিন্তু যদি সেই অবসরটুকুর সুযোগ লইয়া সুজাতা কোথাও চলিয়া যায়! মনের ইচ্ছা তার মনেই দমন করিতে হইল।

সুজাতা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জলের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতেছিল, কে জানে? এইখানেই কি সাঙ্কো পাঞ্জার সহিত তার সাক্ষাৎ হইবে? তাই সে প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে?

সমস্তটাই যেন ঘন তমসাচ্ছন্ন।

চৌদ্দ

লোকে বলে, মৃত্যুর ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই নাকি মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান একবার ফিরিয়া আসে। বিশুরও হয়ত তাই আসিল। রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, নিঃশ্বাসেরও আর তেমন কষ্ট ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও অনুভব করিল, তার পিঞ্জরটি আর দুলিতেছে না, স্থির নিশ্চল হইয়া একই স্থানে অবস্থান করিতেছে।

নিজের অবস্থাটা সম্যক্ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই তার কানে আসিল মৃদু কণ্ঠস্বর—বাহিরে যেন কারা কথা কহিতেছে

একজন বলিল, আরে কেষ্টা, দ্যাখ, দ্যাখ, একটা বয়া এসে তীরে আটকাইল রে!

বিশুর মনে হইল সে চীৎকার করিয়া [illegible] এটা [illegible] নয়, আমার পিঞ্জর। এর ভেতর আমি বন্দী [illegible] পরিবর্তে তার মুখ দিয়া বাহির হইল [illegible] অস্পষ্ট, [illegible]

পূর্ব্বোক্ত লোকটি গভীর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আরে কেষ্টা, এ ভেতর কে কথা কইছেক নয়?

কেষ্টা নামধেয় লোকটি হঠাৎ আতঙ্কাইয়া উঠিয়া কহিল, কথা কই-ছেক্ কি রে বসনা? ভূত টুত হবেক নাকি?

বসনা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, ভূঃ না তোর মুণ্ডু! ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় দিকিন্ তোর কুড়ুলটা...

তুই কি ওটা চেলাবি নাকি?

ঠিক ধরেছিস্। যা যা, চট্ করে যা।

কিন্তু এর ভেতর থাকেই যদি কেউ, তাহলে সে কি আর বাঁচিয়ে থাকবেক।

জলজ্যান্ত লোকটারে শেষে মারিয়ে ছাড়বি রে ?

কথাটা বস্‌নার যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মতলবও তার মাথায় আসিতে দেরী হইল না। তার এক জ্ঞাতি সম্পর্কের ভাই আজ কয়দিন হইল অফিসের ছুটি লইয়া তারই বাড়ীতে আছে। সে একজন ইংরাজী-অভিজ্ঞ লোক। কল-কারখানার কাজও জানে। তাকে ডাকিয়া পাঠাইলে নিশ্চয়ই ইহার একটা কিনারা হইবে। কিন্তু তার পূর্ব্বে বয়াটাকে ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখা প্রয়োজন।

বস্‌না সঙ্গীটির সাহায্যে বয়াটাকে জল হইতে নদীতীরে তুলিয়া রাখিয়া ভাই বিশদকে ডাকিয়া আনিল।

বিশদ আসিয়াই বয়াটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া পরম বিজ্ঞের মত বলিল, [illegible]নলি দস্! তোমরা বোধ হয় থিঙ্ক করছ এটা সাব মেরিন, আসলে কিন্তু তা নয়, এটা একটা মোষ্ট অডিনারি থিং, মানে অতি সাধারণ জিনিষ একটা। আমাদের অফিসে রোজ রোজ এরকম...

কেষ্টা বিরক্ত হইয়া কহিল, আরে বাপু, অত কথার দরকার কি ? তুমি যদি ইটাকে না ভাঙিয়ে খুলতে পার, তার চ্যাষ্টা দেখ।

বিশদ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলিল, এটা না ভেঙে খোলা কি মোষ্ট ডিফিকাল্ট মানে খুব শক্ত বলে মনে করছ নাকি ? আসলে কিন্তু তা নয়, মোষ্ট ইজি এজ ওয়াটার। মানে জলের মত সোজা। নিয়ে এস দিকিন্ স্ক্রু ড্রাইভার। এক মিনিটে খুলে দেবো....

বসুনা ছুটিয়া গিয়া একটা স্ক্রু ড্রাইভার আনিয়া দিল।

নাটগুলা একে একে খুলিতে খুলিতে বিশদ বলিতে লাগিল, এ জিনিষটার নাম বয়া। এগুলোকে চেন দিয়ে মাটীর সঙ্গে বেঁধে গ্যাঞ্জেসের মানে গঙ্গার মাঝখানে ফ্লোট ক'রে মানে ভাসিয়ে রাখা হয়। এই দেখনা এর গায়ে এখনো চেনের পিস্ মানে টুকরো খানিকটা ঝুলছে। আরে দেখ, দেখ, এ পাশটা একেবারে টোল খেয়ে গেছে, বোধ হয় যেন কোন একটা হার্ড থিংয়ের মানে শক্ত জিনিষের সঙ্গে মোষ্ট মার্সিলেসলি মানে খুব নির্ম্মমভাবে ধাক্কা খেয়েছে....

ইতিমধ্যে সে কতগুলা বল্টু খুলিয়া ফেলিয়া বয়ার উপর দিককার ঢাকনা খানিকটা সরাইয়া ফেলিয়াছিল। কেষ্টা তার ভিতরে একবার উঁকি মারিয়াই কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া বলিল, সাত্যই ত! একটা মরদ যে রে...

মরদ? বিশদ বয়াটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

বসনা তাড়াতাড়ি তার পাশে আসিয়া কহিল, মরয়ে গেছেক, না বাঁচিয়ে আছেক রে?

বিশদ জবাব দিল, না, না, মরে নি, এখনো ব্রিদিং হচ্চে, তবে মোষ্ট স্লোলি মানে খুব আস্তে....লোকটাকে তাড়াতাড়ি বাইরের ফ্রি এয়ারে মানে মুক্ত বাতাসে বার করে নিয়ে এলে হয়ত ভ্যালুয়েবল লাইফটা মানে মূল্যবান জীবনটা সেভ মানে রক্ষে হয়েও যেতে পারে!

ধরাধরি করিয়া তারা বিশুর অচৈতন্য দেহটাকে বাহির করিয়া আনিল।

বসুনা বলিয়া উঠিল, আরে, আরে, লোকটার নাকে মুখে ফিনিক দিয়ে যে রক্ত বেরুচ্চেক রে!

কেষ্টা বলিল, নিয্যশ কেউ খুন করিয়ে বন্নাটার ভেতর ভরিয়ে দিয়েছেক!

বিশদ ধমক দিয়া কহিল, ও সব অননেসেসারি টক্‌স্ মানে বাজে বক্তৃতা ছেড়ে দিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি লোকটার সেন্‌স্ মানে জ্ঞান ফিরে আসে, তার ব্যবস্থা কর দিকি। ড্যাম্প মানে ভিজে মাটীতে না শুইয়ে রেখে চল নিয়ে যাওয়া যাক্ নৌকোতে...

বিশুকে তৎক্ষণাৎ নৌকাতেই লইয়া যাওয়া হইল এবং তার জ্ঞান ফিরিয়া পাইতেও বিলম্ব হইল না।

চোখ মেলিয়া চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া বিশু কহিল, এখন আর কিছু নয়, আমি শুধু একটু ঘুমোব....

সত্যই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বদ্‌না কহিল, মোদের আবার কোন ফ্যাসাদে পড়তে হবেক না ত বিশদা?

বিশদ গম্ভীর গলায় জবাব দিল, তার পসিবিলিটি মানে সম্ভাবনা একটু আছে বৈকি!

কেষ্টা মুখব্যাদান করিয়া কহিল, কি বলছক?

বিশদ বলিল, বলছি যা মোষ্ট ট্রুথ মানে খুব সত্যি। হয়ত পুলিস এসে সার্চ মানে খোঁজ করতে পারে...

কেষ্টা ও বদ্‌না উভয়েই হতবুদ্ধির মত সমস্বরে প্রশ্ন করিল, তা হলে উপায়?

বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বিশদ কহিল, উপায় হচ্ছে পুলিসকে আমাদের আগে জানানো....

অনতিবিলম্বেই বিশদকে পুরোভাগে লইয়া কেষ্টা ও বসনা স্থানীয় থানার দিকে অগ্রসর হইল। বিশদ কিন্তু থানার ভিতর যাইতে সাহস পাইল না। ফটকের সামনেই যে পুলিশ-প্রহরীটি দাঁড়াইয়া ছিল, তাকেই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল।

পুলিশ-প্রহরীটি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীটাকে সব কথা জানাইল।

কর্ম্মচারীটি সম্প্রতি বদলি হইয়া এখানে আসিয়াছেন। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি সহসা হস্তক্ষেপ করা সমীচীন বোধ করিলেন না। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকাও ত যায় না। কলিকাতার পুলিশ-অফিসের আনন্দমোহনকে তিনি চিনিতেন, তাঁকেই ফোন করিয়া সব খবর জানানো যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

আনন্দমোহনও এ ব্যাপারে ততটা গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। কিন্তু খবর আসিয়াছে যখন, একজনকে তদন্তে না পাঠাইলেই নয়; তাই তিনি তাঁর অনুগত সহকারী যামিনীকে ডাকিয়া তার উপর এই ভার ন্যস্ত করিলেন।

একাকী গিয়া তাকে তদন্ত করিতে হইবে শুনিয়া যামিনী লাফাইয়া উঠিল। ভাগ্য তার এতটা সুপ্রসন্ন কখনও হয় নাই।

একটা ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিয়া যখন সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল, বসনা প্রমুখ ধীবরের দল যথাযোগ্যই অভ্যর্থনা করিল তাকে।

তীরে, জলে, আকাশে—সর্ব্বত্র একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা বুলাইয়া লইয়া যামিনী প্রশ্ন করিল, এখান থেকেই বুঝি সে লোকটাকে তোমরা উদ্ধার করেছ?

বসনা সবিনয়ে জানাইল, এজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু!

যামিনী চোখ দু'টা বড় বড় করিয়া বলিল, ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু আবার কে?

কেষ্টা জবাব দিল, এজ্ঞে, মোরা ডাক্তার বাবুকেই ডেকিয়ে পাঠায়েছি কিনা।

যামিনী সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি কিন্তু ডাক্তারবাবু নই, পুলিশের লোক। পুলিশের লোক মানে একজন ডিটেকটিভ, বুঝেছ?

বসনা হঠাৎ তার হাত দুটী জড়ো করিয়া বলিল, এজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝিছি। তারপরই সে কেষ্টার দিকে তাকাইয়া বলিল, বিশদা গেল কোথায় হে? ভদ্দরলোকের সাথে একটু কথাবাত্রা কইতক।

থানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশদ সেই যে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়াছিল, আর বাহির হয় নাই।

যামিনী ব্যস্তভাবে কহিল, বিশদার আর দরকার নেই, চল লোকটাকে দেখাবে এবার।

কেষ্টা কহিল, এজ্ঞে, তিনি একটুন্ ঘুমোচ্চেক।

তাতে কিছু যায় আসে না, আমি তাকে জাগাতে পারব।

মোরা কিন্তুন্ পারিনিক, এজ্ঞে। গলা ছেড়ে ডাক পেড়েছি, হাতের জোরে ঝাঁকানি মেরেছি, বড় জোর একটু আটটু গোঁ গোঁ করেছে, তারপরই ব্যস্, যেমন ঘুম, তেমনি...

যামিনী ব্যস্ততার সহিত পা চালাইতে চালাইতে কহিল, অমন কত কুম্ভকর্ণই দেখেছি হে! চল, চল....

নৌকার ভিতর বিশুকে শায়িত দেখিয়া যামিনী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বসনা বুঝিতে পারিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এ ভদ্দর লোকটির সাথে আপনাকার চেনা পরিচয় আছে নাকি, এজ্ঞে?

যামিনী একটু উত্তেজনার সহিতই কহিল, শুধু আমার চেনা? তোমরাও চেনো হে, তোমরাও চেনো।

বসনা অবাক হইয়া বলিল, মোরাও চিনি? কিন্তুন্ মোরা ত কক্ষনো এঁকে দেখি নাই এজ্ঞে?

যামিনী উগ্র কণ্ঠে বলিল, শুধু দেখলেই চেনা যায়, নৈলে আর চেনা যায় না? তুমি তোমার ঠাকুর্দ্দার বাবাকে চেনো?

বসনা বলিল, চিনিনি এজ্ঞে, তবে তেনার নাম শুনেছি।

এত সহজে কত বড একটা সমস্যার সমাধান করিল ভাবিয়া যামিনী গর্ব্বোৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল, তেমনি এঁকে কখন দেখনি, কিন্তু এঁর নাম শুনেছ।

কি নাম এঁর এজ্ঞে?

এর নাম হচ্চে বিশু—বিশু বাবু—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশু? পরভুল বাবুর স্যাঙাৎ? সাঙ্কো পাঞ্জার দুষমণ?

যামিনী বিশুর পকেট হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিল, সাঙ্কো পাঞ্জার দুষমণ নয়, তারও স্যাঙাৎ।

বসনা সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, কিন্তুন্ মোরা শুনেচি যে এজ্ঞে....

যামিনী তাড়াতাড়ি তার পকেট হইতে হাতকড়াটা বাহির করিয়া বিশুর হাতে পরাইতে পরাইতে কহিল, ভুল শুনেচ আর এতদিন আমরাও ভুল করে এসেছি....

কি ভুল যে তারা করিয়াছে, বসনাও বুঝিল না; কেষ্টাও বুঝিল না।

কিন্তু মুমূর্ষু ওই প্রাণীটার হাতে হাতকড়া পরাইতে দেখিয়া তাদের বুকের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিল।

বসনা চোখের জল কোনমতে রোধ করিয়া বলিল, আপনি কি ওনাকে গ্রিপ্তার করলেন, এজ্ঞে?

যামিনী অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, গ্রেপ্তার করব না? ও আজ আমাদের শত্রু, প্রতুল বাবুর শত্রু....

যামিনী হয়ত আরও কিছু বলিত, কিন্তু বলা আর হইল না, হঠাৎ তাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া বিশু হাসিয়া উঠিল—অট্টহাসি। ভীষণ বিস্ফোরণ-শব্দের মতই যামিনীর কানে আসিয়া বাজিল।

পনেরো

অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিবার পর কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, নির্ণয় করিবার জন্য একজন বিচারকের নিকট তাদের লইয়া যাওয়া হয়। বিশুকেও যাইতে হইল।

বিচারক তখন অখণ্ড মনোযোগের সহিত পুলিশের রিপোর্টটা পাঠ করিতেছিলেন। বিশু সেখানে উপস্থিত হইয়াই হাসিমুখে হাত জোড় করিয়া কহিল, ধর্ম্মাবতার, আমার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

রিপোর্টের পাতা হইতে মুখ না তুলিয়াই বিচারক বলিলেন, সে কথা ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি? আগে আমি পুলিশের বক্তব্য যা, পড়ে নিই, তারপর যা প্রশ্ন করা হবে, তার জবাব দেবেন আপনি!

পূর্ব্বের মতই হাসিতে হাসিতে বিশু কহিল, মাপ করবেন ধর্ম্মাবতার, অযাচিত ভাবে আমার নাম বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনি শুনে হয়ত আমার ওপর ব্যবহার করবেন অন্যরকম—অন্ততঃ সাধারণ বন্দীদের মত নয়ই?

বিচারক অঙ্গুল নির্দ্দেশে তাকে চুপ করিতে বলিয়া অস্ফুট কণ্ঠে পড়িয়া যাইতে লাগিলেন, গঙ্গাতীরে একটি বয়ার মধ্যে ইহাকে পাওয়া যায়. বয়ার মধ্যে? হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিশুর দিকে তাকাইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, তাহলে আপনি একটা বয়ার মধ্যে ছিলেন?

বিশু হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিল, লোকের মুখে তাইত শুনেছি।

—কি কাজে গিয়ে ছিলেন সেখানে?

তিলে তিলে মরণের পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

বিচারক বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল কি ওই?

বিশু জবাব দিল, কিন্তু ও ছাড়া ত উত্তর দেবার কিছুই নেই আমার।

আছে কি না আছে, বুঝবে আদালত।

আদালত মানে? আপনি কি আমাকে সেখান পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন নাকি?

আপনি কি মনে করেন ছুটি আপনার এখান থেকেই হবে?

মনে করা কি অন্যায়?

ন্যায়ই বা মনে করেন কিসে, জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই। কারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধিই বলবে, এভাবে আমাকে আটক করে রাখা অন্যায়।

আপনার ধারণাটাও কি তাই?

বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, শুধু ধারণা নয়, আমি সেটা সত্যি বলেই প্রমাণ করব। প্রথমে ধরা যাক, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি। আপনারা বলবেন, আমি সাঙ্কো পাঞ্জাকে মুক্তি দিয়েছি। তাই যদি সত্য হয়, তাহলে সেই উপকারের প্রত্যুপকারের স্বরূপই কি সে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল?

বিচারক অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বড়ই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে, আপনার কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।

বিশু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, আপনি যদি কোনদিন আমার অবস্থায় পড়েন....

বিচারক বাধা দিয়া কহিলেন, প্রগল্‌ভতা!

বিশু সঙ্গে সঙ্গে কহিয়া উঠিল, মোটেই নয়, বরং বলতে পারেন স্পষ্ট-বাদিতা। যাই হোক্‌, আমার পক্ষীয় একজন সাক্ষ্যের দাবী আইনতঃ আমি করতে পারি কি?

দাবী করতে পারেন না, অনুরোধ করতে পারেন।

বেশ, অনুরোধই করছি মিঃ মিত্রের কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে।

মিঃ মিত্র একদিন বিচারকের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন, আজ তিনি এড্‌ভোকেট জেনারেল।

তাঁর নাম শুনিয়া বিচারক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, বেশ, তাঁর কাছেই আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি—অবিশ্যি যদি তিনি দেখা করতে চান।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা টিপিতেই যে পুলিশ-প্রহরীটি হাজির হইল, তারই হাতে তিনি একটুকরা কাগজ লিখিয়া পাঠাইলেন মিঃ মিত্রের কাছে।

বিশু অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, ইতিপূর্ব্বে যে পুলিশেরই সহায়তার জন্যে হাজারবার জীবন বিপন্ন করেছে, আজ তারই হাতে পড়েছে লোহার শিকল! এরই নাম প্রত্যুপকার! এরই নাম কৃতজ্ঞতা!

বিশুর কথার উত্তরে বিচারক আর কিছুই বলিলেন না।

প্রায় মিনিট দশেক পরে মিঃ মিত্রের নিকট হইতে খবর আসিল, বিশুর সহিত দেখা করিতে তাঁর কোন আপত্তিই নাই।

বিশুকে মিঃ মিত্রের অভিমত জানাইয়া বিচারক বলিলেন, মিঃ মিত্র যদি আপনাকে মুক্তি দেন, আমি খুসীই হবো তাতে। আশা করি ভবিষ্যতে আবার আমাদের দেখা হবে।

মিঃ মিত্রের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বিশু শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, দেখা না হলেই কিন্তু খুব খুসী হ'বো আমি

প্রতুল ও বিশুর উপর মিঃ মিত্রের খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি জানিতেন, দেশকে যদি কেহ সোস্কো পাঞ্জাব কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে, সে প্রতুল ও বিশু।

মিঃ মিত্রের কক্ষে ঢুকিয়া হাসিমুখেই বিশু কহিল, গুড্ মর্ণিং মিঃ মিত্র।

মিঃ মিত্র চেয়ার হইতে উঠিয়া বিশুর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, 'মর্ণিং। ব্যাপারটা কি বলুন ত বিশু বাবু?

বিশু তার শৃঙ্খলিত হাত দু'টা মিঃ মিত্রের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ব্যাপারটা নিজের চোখেই দেখুন।

তা ত দেখছি। কিন্তু কেন? শুনছি যা··

বিশ্বাস করতে পারেন না, কেমন?

অথচ বিশ্বাস না করেও উপায় নেই। সত্যি যা ঘটেছে, তা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

অস্বীকার আমি কিছুই করতে চাই না। সেইজন্যে আসল ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলতে চাই।

মিঃ মিত্র টেবিলের উপর হাত দু'টা রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে বিশুর পানে তাকাইয়া বলিলেন, আসল ব্যাপারটা খুলে বলবেন আমাকে? . . কথাই গোপন করবেন না ত? শেষের দিকে কণ্ঠস্বরটা তাঁর অত্যন্ত কঠিন ও নীরস শোনাইল।

বিশু ইহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, কথাটা আমাদের গোপনে হলেই ভাল হয়, মিঃ মিত্র।

মিঃ মিত্র তাঁর কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনারা দয়া করে পাশের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন একটু, দরকার হলেই ডাকব।

মিঃ মিত্রের শেষ কথাটায় কোন অর্থই বিশু খুঁজিয়া পাইল না। তবে তিনি কি সত্যই এখনও তাকে সন্দেহ করেন?

ঘর হইতে কর্ম্মচারীরা নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইতেই মিঃ মিত্র কহিলেন, আপনার কি বলবার আছে, বলুন বিশুবাবু। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনি?

বিশু পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, এতক্ষণ ছিলুম আমি একটা বয়ার মধ্যে; তার আগে ভাসছিলুম গঙ্গার বুকে; তার আগে সাঙ্কো পাঞ্জার সামনে; তার আগে একটা সিন্দুকের ভেতর। তারও আগে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম আমি যখন কাজ সুরু করি, তখন আমার পাশে ছিল সুনন্দা, আমি মোটর চালাচ্ছিলুম....

মিঃ মিত্র অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, আপনার এ কথার কোন মূল্য আছে কি?

বিশু কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয়ই। এর প্রতিটী বর্ণ সত্য।

বেশ, তারপর আর কিছু বলবার আছে আপনার?

আপনারা শুনেছেন, দস্যুসম্রাট সাঙ্কো পাঞ্জাকে আমি মুক্তি দিয়েছি, কিন্তু সেটা একেবারে ভুল।

ভুল মানে?

তাকে মুক্তি দোব কি সে বন্দীই হয়নি।

কিন্তু প্রতুলবাবু তাকে স্বহস্তে বন্দী করেছিলেন যে?

এখানেই সে ভুল করেছিল।

সাঙ্কো পাঞ্জাকে বন্দী না করেই তিনি...

ভুল কে না করে, মিঃ মিত্র ?

কিন্তু আপনি এটা নিশ্চয় করে বলতে পারেন ?

নিশ্চয় মানে ? রাত্রির পর দিন আসে, দিনের পর রাত্রি—এটা যেমন আমি নিশ্চয় জানি, তেমনি এর মধ্যে এতটুকু সন্দেহের স্থান নেই। যাক, তারপর আমি যা বলতে চাই। সাঙ্কো পাঞ্জাকে আমি মুক্তি দিইনি বটে, তবে এটা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, তার জীবন রক্ষার জন্যে জীবনটা আমার বিপন্ন করে তুলেছিলুম।

কথাটা যেন স্পষ্ট শুনিতে পান নাই, এমনই ভাবে মিঃ মিত্র বলিয়া উঠিলেন, কার জীবন রক্ষার জন্যে ? সাঙ্কো পাঞ্জার ?

হ্যাঁ, সাঙ্কো পাঞ্জার। প্রতিদানে তার আমি কি পেয়েছি জানেন ? সাঙ্কো পাঞ্জা আমারই বুকে গুলি ছুঁড়েছিল। কিন্তু কপিঞ্জল...

কপিঞ্জল আবার কে ?

চেনেন না আপনি তাকে ? খাসা ছোকরা! চমৎকার বুদ্ধি। সাঙ্কো পাঞ্জা আমাকে গুলি করলে বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না, সে তার দলের কি....

কথাটা তার আর শেষ হইল না ; মিঃ মিত্রের দৃঢ়-সংকল্পিত মুখের দিকে নজর পড়িতেই সে স্তব্ধ হইয়া গেল। না, এ ভাবে মুক্তির আশা তার দুরাশা মাত্র। তাই সে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

হাসিটা তার কৃত্রিম বুঝিয়াও মিঃ মিত্র তার সহিত হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখে তাঁর হাসি ফুটিল না।

কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বিশু বলিল, আসল কথাটা কি জানেন? এখান থেকে মুক্তি পেয়েই আমি কাগজে এই ধরণের একটা গল্প লিখব। গল্পটা জমবে কি না—তাই পরখ ক'রে দেখছিলুম। যাক্, সাঙ্কো পাঞ্জাকে ত আমি মুক্তি দিলুম, তারপরই ভাগ্যচক্রে হঠাৎ সুনন্দার সঙ্গে দেখা। সুনন্দাকে চেনেন ত?

সাঙ্কো পাঞ্জার মেয়ে সুনন্দা ত?

ওটাই শুধু তার পরিচয় নয়...

কিন্তু সে পরিচয় ত তিনি স্বীকার করেন নি শুনেছি।

মিথ্যে শুনেছেন।

কোন্‌টা মিথ্যে আর কোন্‌টা সত্যি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিশুবাবু!

তাহলে বলতে হবে একান্তই দুর্ভাগ্য আমার।

ঘটনাগুলো এমনি রোমাঞ্চকর যে, নিজেকে নিজেই আমার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে, আমি জেগে আছি—না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি?

শুনে আপনি একথা বলছেন, কিন্তু আমি যখন ঘটনাগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করি, বহুবার ওই একই প্রশ্ন করেছি নিজেকে।

সেই জন্যেই বলছি, আমার নিজের দিক থেকে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

সাবধানতা?

হ্যাঁ। আপনি যে সব ঘটনার কথা বলছেন, আমি চাই তার একটা সাক্ষ্য রাখতে অর্থাৎ আপনার কথাগুলো আমি লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই।

তাতে আমার আপত্তি কি? আমার কথাগুলো আপনি নোট করে রাখতে চান তো?

হ্যাঁ, নোট করেই রাখতে চাই, তবে নিজের হাতে নয়, একজন টাইপিষ্ট দিয়ে। তাতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?

মোটেই না।

বেশ, তাহলে আমার টাইপিষ্টকে ডাকি। বলিয়াই মিঃ মিত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলেন।

বিশুর কৌতূহল হইল। টাইপিষ্টকে ডাকিতে বাহিরে যাইবার ত প্রয়োজন ছিল না, ঘণ্টাটা টিপিয়া দিলেই হইত। তবে কি এখনও তাঁর সন্দেহ মোচন হয় নাই?

পা টিপিয়া টিপিয়া বিশু দরজার পাশে গিয়া কান পাতিল—বাহির হইতে যদি কিছু শুনিতে পাওয়া যায়।

মিঃ মিত্র একজন পুলিস-প্রহরীকে আদেশ করিলেন, পাগলা-গারদের ডাক্তার মিঃ ঘোষকে ডেকে নিয়ে এস তো রামদীন!

পাগলা-গারদের ডাক্তার। মিঃ মিত্র কি বিশুকে পাগল বলিয়া স্থির করিলেন?

বিশু রাগে ফুলিতে লাগিল।

অবরুদ্ধ ক্রোধে নিজের মনেই বিশু গর্জ্জন করিয়া উঠিল, অবশেষে মিঃ মিত্রও মনে করলেন, আমি পাগল! ভাগ্যিস বক্তব্যটা ওঁর শুনতে পেলুম...

অতঃপর বিশু তার কার্য্যপন্থা স্থির করিয়া লইল। যতদূর মনে হয়, ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত মিঃ মিত্র আর এখানে ফিরিয়া আসিবেন না। সেই অবসরটুকুর মধ্যে তাকে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু হাতে লৌহ-শৃঙ্খল, তত্রাচ সে হতাশ হইল না। প্রথমেই দিল দরজাটা অর্গলবদ্ধ করিয়া। তারপর জানালার ধারে একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া গিয়া সেটাকে এমনভাবে রাখিল, যেন দেখিলেই মনে হয়, জানালার ভিতর দিয়া কেহ পলাইয়াছে। সন্দেহটা দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে জানালার পর্দ্দাটা টুকরা টুকরা ছিঁড়িয়া, গিঁট বাঁধিয়া নিচের দিকে সে ঝুলাইয়া দিল।

তারপর চকিত দৃষ্টিটা ঘরের চারিদিকে একবার বুলাইয়া লইয়া লুকাইবার একটি স্থানও সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

মিঃ মিত্রের আসন যেখানে, ঠিক তার পিছন দিকে ক্ষুদ্র একটা দ্বার; সেটা ঠেলিয়া বিশু ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, পুরাণো খাতা-পত্রাদি রাখিবার একটা গুদাম। মন তার আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। লুকাইবার পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান আর নাই। তা ছাড়া যেখানে সে

লুক্কায়িত হোক না কেন, ধরা পড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই—পলায়নের এমনি নিখুঁত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল প্রতুলের একটা কথা—সব চেয়ে গোপনীয় স্থান সেটা, মানুষ ইচ্ছা করিলেই যেখানে নজর দিতে পারে।

দু'চারখানা খাতা-পত্র সরাইয়া সেই আবর্জ্জনার মধ্যেই বিশু তার ঠাঁই করিয়া লইল। ঠিক তার পর মুহূর্ত্তেই শোনা গেল, দরজায় মৃদু করাঘাত।

বিশু বুঝিল, এইবার তার ভাগ্য পরীক্ষা।

সাধারণ করাঘাতে যখন দরজা খুলিল না, সুরু হইল জোর ধাক্কা এবং সে ধাক্কার বেগ সহিতে না পারিয়া ক্ষীণকায় কাঠের অর্গলটা ভাঙিয়া পড়িয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল একদল লোক। তাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য অধীর আগ্রহে বিশু কান পাতিয়া রহিল।

প্রথমেই শোনা গেল মিঃ মিত্রের নৈরাশ্য-ক্ষুব্ধ উত্তেজিত কণ্ঠ: ওই—ওই যে—ওই জানালা দিয়ে পালিয়েছে। পাগল হয়ে লোকটা একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে দেখছি। নৈলে এত উঁচু থেকে এ ভাবে পালাবার সাহস করতে পারে! আর তার সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মিঃ মিত্রের কথার উত্তরে বিশু মনে মনে কহিল, সন্ধান পাওয়া যাবে না যখন, নিশ্চয়ই আর অনর্থক অনুসন্ধান করে দেখবেন না, মিঃ মিত্র!

মিঃ মিত্র পরক্ষণেই আদেশের সুরে বলিলেন, প্রহরীদের সাবধান করে দাও, প্রত্যেক গুপ্ত স্থান অনুসন্ধান করবার জন্যে লোক নিযুক্ত কর আর এখুনিই একটা ফোন করে দাও পুলিস-অফিসে।

বিশু খুসী হইয়া আত্মগতই কহিয়া উঠিল, তাহলে হয়ত প্রতুলের সন্ধানটাও মিলে যেতে পারে।

মিঃ মিত্র এবার বোধ হয় ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, লোকটা যে পাগল হয়ে গেছে, তা আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলুম তার আজগুবি সব গল্পগুজব শুনে। তবে আমারই ভুল হয়েছিল তাকে একলা ফেলে রেখে যাওয়া...

এইভাবেই সময়টা অতি ধীরে—অতি মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। শুধু কথার পর কথা—পাগলের সম্বন্ধে কার কি অভিজ্ঞতা আছে তারই ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা...

বিশু এদিকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। একে স্বল্প-পরিসর স্থান তার উপর মশার কামড়। একটু নড়িয়া বসিবার বা মশা তাড়াইবার কোন উপায় নাই, তা হইলেই শব্দ হইবে....

সময়ের কোন ধারণাই বিশুর ছিল না। ক্রমে যেন মনে হইল, বাহিরের গোলমাল একটু কমিয়া আসিতেছে, ভিতরেও আর বিশেষ কোন আলোচনা হইতেছে না। ছুটির সময় নিশ্চয়ই আসন্ন...

হাত-পাগুলা তার অবশ হইয়া আসিতেছিল। এভাবে আর কতক্ষণ থাকা যায়? অথচ আত্মপ্রকাশ করিবার সময়ও এখন আসে নাই। প্রতিটী সেকেণ্ড বিশু মনে মনে গুণিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর হঠাৎ আনন্দমোহনের পরিচিত কণ্ঠ শোনা গেল: কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না মিঃ মিত্র!

মিঃ মিত্র বিরক্তিভরেই বলিয়া উঠিলেন, তাহলে আপনার লোকগুলো কোন কাজেরই নয়, দেখছি!

আনন্দমোহন শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন, তা আপনি যা বলতে হয় বলুন, কিন্তু আমি যা বলতে এসেছি…

কি বলতে চান আপনি?

আমি বলতে চাই, এভাবে এখানে অনুসন্ধান করে কোন ফল হবে না জেনে আপাততঃ আমি সে কাজটা বন্ধ করে দিয়েছি।

বন্ধ করে দিয়েছেন? তার মানে? তাহলে আপনি বিশুবাবুর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন, বলুন?

এতে আর জয়-পরাজয় কি!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মিঃ মিত্র বলিলেন, এখন আমি বুঝতে পারছি, দিনের পর দিন সাক্ষো পাঞ্জা আপনাদেরই চোখের সামনে দিয়ে কেমন ক'রে তার অত্যাচারের শকট চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে….

কথাটা বোধ করি মিঃ মিত্র আর শেষ করিলেন না, সপদদাপেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আনন্দমোহনও যে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করিলেন, বিশুর বুঝিতে বাকী রহিল না।

বাহির হইতে সজোরে দরজা বন্ধ করিবার শব্দ তার কানে আসিয়া পৌছিল। নিশ্চন্ত হইল সে। তারপরই সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন হইবার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্তর্পিত পদে সে বিচার-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এবার শুধু পলায়নের চিন্তা। লৌহ-শৃঙ্খলটার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব।

চিন্তামগ্ন মস্তিষ্কে বিশু ঘরের ভিতর পায়চারী করিয়া বেড়াইতে

লাগিল। কিন্তু কোন উপায়ই সে স্থির করিতে পারিল না। বিচার কক্ষে টেবিল-চেয়ার ছাড়া এমন কোন জিনিষ ছিল না, যার দ্বারা শিকল কাটা যাইতে পারে।

ঘুরিতে ঘুরিতেই বিশুর নজরে পড়িল, কাঠের আলনাটার উপর কালো একটা আলখাল্লা ঝুলিতেছে। সে বুঝিল, মিঃ মিত্রেরই গাউন এটা।

কিন্তু ওসব তার কোন কাজেই লাগিবে না—যতক্ষণ না এই অভিশপ্ত লৌহ-শৃঙ্খলের বন্ধন হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছে।

কিন্তু হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎ বিকাশের মতই তার মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। নাই বা পাইল সে এ বন্ধন হইতে মুক্তি, ওই কালো আলখাল্লাটা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, যদি সে আদালত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে?

পরক্ষণেই তার মনে হইল, কিন্তু আলখাল্লার হাতদুটা লইয়া সে কি করিবে?

যুক্তি যোগাইতেও বিলম্ব হইল না। আলখাল্লার হাতদুটা উল্টাইয়া সে ভিতরের দিকে ঢুকাইয়া দিল এবং অত্যধিক শীতের জন্য নিজের হাতদুটা বুকের উপর গুটাইয়া রাখিল।

এবার তার বাহির হইবার পালা। যদি মিঃ মিত্রের কোন কর্ম্মচারী তাকে দেখিতে পায়, তাহইলে তৎক্ষণাৎ চিনিয়া ফেলিবে। যদি বা কোন রকমে তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করা যায়, বাহিরে তোরণ-দ্বারে পুনরায় সজাগ প্রহরী। এটুকু বিপদ মাথায় করিয়া না লইলে মুক্তিলাভ অসম্ভব। বিশু ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকদূর অগ্রসর হইতেই দেখিল পাশাপাশি দুটি সিঁড়ি—একটি নামিয়া গেছে নিচে অফিস-ঘরের দিকে, আর একটি বাহির-প্রাঙ্গণে। বিশু সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিতে যাইবে, হঠাৎ শোনা গেল একটি নারী-কণ্ঠ: অফিস-ঘরে যাবার সিঁড়ি কোন্‌টা দেখিয়ে দিন না।

সঙ্গে সঙ্গে বিশু চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, তার পিছনে দাঁড়াইয়া একটি মহিলা। কোলে তার নিদ্রিত একটি শিশু, সম্ভবতঃ অসুস্থ, আর একটি শিশুর হাত ধরিয়া আছে—ছেলেটি হয়ত সম্প্রতি চলিতে শিখিয়াছে।

মহিলাটি যে কে—এখানেই বা এখন কি প্রয়োজনে আসিয়াছে, কৌতূহল হইলেও বিশু জানিতে চাহিল না। তাড়াতাড়ি হস্তনির্দ্দেশে সে পাশের সিঁড়িটা দেখাইতে যাইবে, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল হাতদুটা তার শৃঙ্খলাবদ্ধ...

মেয়েটি তা লক্ষ্য করিল। অসহ্য বিস্ময়ে চোখদুটা বড় বড় করিয়া কহিল, একি! আপনার হাত...

বাধা দিয়া বিশু দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, চুপ! আর একটা কথাও না। হাত দেখে ত বুঝতেই পেরেছেন আমি একজন কয়েদী, আর আমি পালাচ্চি তাও বোধ হয় আপনার জানতে বাকী নেই?

কিন্তু কে আপনি?

পরিচয় দিলে চিনতে পারবেন? তা হয়ত পারতেও পারেন। আমার নাম বিশু—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিশুর নাম অনেকেই শুনিয়াছে, তবে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় নাই। মহিলাটী বর্দ্ধিত বিস্ময়ে পুনরায় প্রশ্ন করিল, আপনি বিশু বাবু? প্রতুল বাবুর....

তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বিশু বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রতুল বাবুর বন্ধু বিশু বাবু।

কিন্তু বিশু বাবু ত....

তাকে শেষ করিতে না দিয়া বিশু পুনরায় বলিয়া উঠিল হ্যাঁ, হ্যাঁ, নেহাৎ ভাগ্যের দোষেই বিশুবাবুর হাতে আজ শিকল পরেছে। কিন্তু আপনি অত ভয় পাচ্চেন কেন? বিশু বাবুকে দেখে ভয় পাবার ত কিছু নেই। শুনুন যাবার আগে একটা কথা আপনাকে বলে যাই, আগামী কালের 'বিশ্বদূত'খানা পড়ে দেখবেন, তাহলে ব্যাপারটার আগাগোড়া সব বুঝতে পারবেন। যান আপনি এই সিঁড়ি দিয়ে, আর আমার এই সিঁড়ি....

বিশু আর মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল না। এক এক লাফে তিন চারিটা ধাপ অতিক্রম করিয়া নিচে নামিতে লাগিল এবং নিজের মনেই বলিল, ভাগ্যিস্ যার সঙ্গে দেখা হল, সে একজন নারী, তাই তার হাত থেকে অত সহজে নিস্কৃতি পেয়ে গেলুম। এখানেই পুরুষ আর নারী-মনের পার্থক্য। অন্ততঃ ওরা সব ত সুনন্দারই জাত।

নিচে নামিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই তার মনে নারীজাতীর উপর যে সদয়-করুণার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল, একেবারে তার ভিত্তিতে গিয়া ঘা পড়িল। দেখিল, মহিলাটী তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না গিয়া তারই পিছু পিছু নিচে নামিয়া আসিয়াছে, এবং তোরণ-দ্বারের প্রহরীটীর সহিত মৃদুকণ্ঠে কি কথা কহিতেছে।

বিশুর বুকের রক্ত চমক খাইয়া উঠিল। নারীমাত্রেই যে সুনন্দার জাত, এ বিশ্বাসটা অন্ততঃ তার সেই মুহূর্ত্তেই দূরীভূত হইল।

প্রহরীটি তন্ময় হইয়াই মেয়েটির কথা শুনিতেছিল। বিশু সুযোগ বুঝিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে তোরণটা অতিক্রম করিয়া গেল।

বাহির হইয়া পথে পড়িতেই দেখিল একটা ট্যাক্সি। চলন্ত গাড়ীটাতে লাফাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি সে ড্রাইভারকে বলিল, জোরে চালাও, দেখছ না! ডাইভোর্স কেস ...কমলি নেই ছোড়তা হায়....

ট্যাক্সি উল্কার মত দ্রুতগতিতে ছুটিল।

সম্প্রতি যে বাসাটা বিশু ভাড়া লইয়াছিল, তারই ঠিকানা সে ড্রাইভারকে বলিয়া দিল। পুতুলের কাছে ফিরিয়া যাওয়া এখন ঠিক হইবে না, কে জানে, সেখানে পুলিশ-প্রহরী মোতায়েন হইয়া আছে কি না?

বাসার সামনে আসিয়া গাড়ী থামিতেই ড্রাইভারকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বিশু ভিতরে প্রবেশ করিল।

গৃহস্বামিনীটির সহিত বিশুর পরিচয় অনেক দিনের। ভাড়াটেরা সকলেই তাঁকে পিসিমা বলিয়া ডাকিত, বিশুও ডাকিত তাই বলিয়া।

ভিতরে প্রবেশ করিতেই প্রথমে দেখা হইল পিসিমার সঙ্গে। পিসিমা অনুযোগের সুরে কহিলেন, কোথায় গেছলে বাবা? বলা নেই, কওয়া নেই...

বিশু বলিল, বিশেষ একটা দরকারী কাজে হঠাৎ আটকে গেছলুম পিসিমা! তুমি এখন দাও ত গাড়ীটার ভাড়া মিটিয়ে...

পিসিমা আপত্তি করিলেন না।

বিশু উপরে উঠিতেছিল। পিসিমার ডাক আসিল, তুমি কি ওপরে গেলে বাবা?

বিশু সেখান হইতেই জবাব দিল, হ্যাঁ, কোন দরকার আছে পিসিমা?

তোমার একখানা চিঠি আছে, বাবা।

চিঠি! বিশুর কণ্ঠে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল।

পিসিমা বলিলেন, হ্যাঁ বাবা, খামের চিঠি একখানা। ওপরে খুব বড় বড় আখরে লেখা—গোপনীয়। ·বৌমা দিয়েছেন হয়ত·

চিঠিটা হাতে লইয়া পিসিমাই উপরে উঠিতেছিলেন, বিশু তাঁকে থামাইয়া দিয়া কহিল, না, না, আমিই যাচ্চি, পিসিমা, তোমাকে আর ওপরে উঠতে হবে না।

পিসিমার পাশে আসিয়া বিশু পুনরায় মুস্কিলে পড়িল। হাত শৃঙ্খলাবদ্ধ চিঠি লইবার উপায় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া উঠিল, চিঠিখানা তুমি ওই সিঁড়ির ওপর রাখো পিসিমা। কাপড়-চোপড় আমার নোংরা, তুমি আবার ছুঁয়ে ফেলবে!

হস্তাক্ষর দেখিয়া বিশুর বুঝিতে বাকী রহিল না, চিঠিখানার লেখিকা কে! কিন্তু সত্যই কি লিখিয়াছে সে? হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হইল, সুনন্দা চিঠি লিখিবে তাকে?

সতেরো

সিঁড়ি হইতে তাড়াতাড়ি চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া বিশু নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। সেদিনও রাত্রে সে কপিঞ্জলের হাতে সুনন্দার একখানা চিঠি পাইয়াছিল, কিন্তু তাতে তার এত আনন্দ হয় নাই। কপিঞ্জলও তার অংশ লইয়াছিল। কিন্তু আজ?

আজ এই চিঠিখানা তার একান্ত নিজস্ব, কারও দাবী নাই এতে, কেহ অনুরোধ করিয়াও লেখায় নাই। তাছাড়া, সেদিনের চিঠিখানা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, শুধু নীরস কাজের কথায় পূর্ণ। আর আজ এ দীর্ঘ চিঠিখানায় আছে শুধু তারই কথা।

খামখানা ছিঁড়িয়া বিশু পড়িতে সুরু করিল:

প্রিয়তম, আমারই জন্যে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করতে ছুটেছিলে, কিন্তু তার বিনিময়ে যা পেয়েছ, ভাবলেও আমার অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে!

আমি জানি, সেদিন তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে। যাকে আমি চিরকাল ভয় করে এসেছি, যার ওপর আমার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার অন্ত নেই, তারই ছদ্মবেশে তারই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমি যে অভিনয় করেছিলুম, আজ আর নিশ্চয়ই তোমার তা অজানা নেই।

সেই নকল গাঙ্কো পাঞ্জাকে পালাবার সুযোগ দিয়েছিলে তুমি, তাতে কি তোমার অন্যায় হয়েছিল?

তারপর বাবার প্রধান অনুচর কপিঞ্জল তোমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যখন তোমার সঙ্গে কথা কইতে লাগল, তখন আমি কেবলিই ভাবছিলুম, কত বড় বিপদের মধ্যে যে তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছি, তা তুমি নিজে ত জানই না, আমারও অগোচর। কিন্তু তবু কি আমি অন্যায় করেছিলুম?

আমি জানি, তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র সুহৃৎ, যে কোন বিপদই তৃণের মত তুচ্ছ মনে ক'রে নির্ব্বিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পার। তুমি সাহসী, তুমি সবল, বিপদ তোমাকে দেখে ভয় পায়, তুমি বিপদকে ভয় কর না।

কি যে ভয়াবহ নৃশংস কাজ করতে বাবা উদ্যত হয়েছেন, তা যদি তোমাকে জানাতে পারতুম! কিন্তু তার কোন উপায়ই নেই। কেন, তা তুমি অনায়াসেই ভেবে নিতে পার। এমন সে কাজ—যার জন্যে সাঙ্কো পাঞ্জার একমাত্র আদরিণী কন্যা হয়েও আমি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি।

তোমার সব খবরই আমি জানি, পেয়েছি। কি করে পেয়েছি, তা তোমার জেনে দরকার নেই। আমি জানি, কপিঞ্জলকে বাবার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন তুমি বিপন্ন করে তুলেছিলে। আমি জানি, কপিঞ্জলেরই উদ্দেশে ছোড়া গুলি তুমি নিজের বুক

পেতে নিয়ে তাকে করলে নিরাপদ, আর নিজে করলে ভূশয্যা-গ্রহণ।

তারপর যখন কপিঞ্জলের মুখে শুনলুম, ইহজগৎ থেকে বিদায় দেবার জন্যে তোমাকে বাবা একটা বয়ার ভেতর পুরে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন, তখন কি করে যে আমি নিজেকে সংবরণ করেছিলুম, একমাত্র ভগবানই জানেন! আমার জন্মদাতা না হয়ে যদি তিনি সৃষ্টি কর্ত্তাই হতেন, তবু তাঁকে ক্ষমা করতে পারতুম না।

তথাপি আজ তোমাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি, বিপদের নিষ্ঠুর কবল থেকে তুমি যে মুক্তিলাভ করেছ, তার আংশিক উপলক্ষ্য আমি হলেও একমাত্র ভগবানের আশীর্ব্বাদেই তা সম্ভবপর হয়েছে। দিনরাত আমি সেইজন্যেই ভগবানকে ডাকছি, তুমিও ডেকো। জেনো স্বামী-স্ত্রীর মনের ঐকান্তিক কামনা একমাত্র তিনিই পূর্ণ করতে পারেন।

তুমি যে বিপদের হাত থেকে এখনো পূর্ণ মুক্তি পাওনি, একথা বোধ করি না বললেও চলে। অনিশ্চি এর জন্যে দায়ী আমি! পুলিস এখনও তোমাকে সাক্ষো পাঞ্জার মুক্তিদাতা বলে সন্দেহ করে। তবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিথ্যা কখনও সত্য হয় না, একদিন না একদিন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং বুঝতে পেরে তোমার ওপর সুবিচার করবে, সে দিনের জন্যে

তোমাকে মুখ বুজেই অপেক্ষা করতে হবে। পারবে না তুমি? অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে?

আর তোমাকে বিশেষ কিছু বলবার নেই, শুধু একটা জিনিষ চাওয়া বাকী। আশা করি, চাইলে সেটা দিতে তুমি কুণ্ঠাবোধ করবে না।

চাইতে যদিও আমার মন সরছে না, তবু আমায় চাইতেই হবে, তোমাকে দিতেও হবে সুনিশ্চিত। আমি তোমার কাছে এবার বিদায় চাই। আমাকে তুমি বিদায় দাও প্রিয়তম।

তোমার সান্নিধ্য থেকে আমাকে এবার দূরে যেতেই হবে, না গিয়ে কোন উপায় নেই। তবে তুমি মনে ক'রো না যেন, কারও ওপর রাগ ক'রে আমি যাচ্ছি অথবা কেউ আমাকে আদেশ করেছে যেতে। আমি যাচ্ছি স্বেচ্ছায়। যাবার আগে শুধু আমার মনে পড়ছে, বাবার কাছে আমি শপথ করেছিলুম, ভবিষ্যতে কোনদিন তোমার স্বত্ব স্বীকার করব না বা তোমার সঙ্গে কখনো মিলিত হব না। তার পরিবর্তে বাবাও আমার কাছে শপথ করেছিলেন— কি সে শপথ তুমি জান না, তোমাকে জানাবারও উপায় নেই আমার।

যদি জানতে, [illegible] পারতুম, তাহলে বুঝতে [illegible]।

আমি আমার শপথ মেনে চলব যতদিন, উনিও ততদিন তাঁর শপথ অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

বিদায়—তাহলে বিদায়, বন্ধু।

চেষ্টা ক'র আমাকে ভোলবার, জীবনে যেন কোনদিন আর আমাদের পরস্পরের দেখা না হয়।

কোথায় যে আমি যাচ্চি, তোমাকে তা বলতে পারব না, বলবার উপায় নেই। দূরে—আরো দূরে—আরো দূরে—হয়ত সাগরের অপর পারে।

আমার কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয়নি। যার জন্যে তুমি কপিঞ্জলের সঙ্গে সেদিন রাত্রে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলে, সে কাজও আজ অসম্পূর্ণ। সাঙ্কো পাঞ্জা এখনো তার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করেনি।

কিন্তু সেই দুরভিসন্ধি ত্যাগ করতেই হবে তাকে—সেইজন্যে আমার এই দুঃসাহসিক অভিযান। নারী আমি, তাতে কি আসে যায়? মন হয়ত আমাদের কোমল, কিন্তু শক্তিগর্ব্ব কোন পুরুষের চেয়ে কম নয়।

এ কাজে আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই, স্বার্থ সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে নির্য্যাতিত দেশবাসীর। তাদের কল্যাণোদ্দেশেই আমি তোমার মায়া, দেশের মায়া কাটাতে চলেছি।

কিন্তু তুমি আমার একনিষ্ঠতায় সন্দেহ করনি ত? তাহলে আমার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। জেনো এ

জগতে আমি একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছিলুম, এখনও ভালবাসি, এবং যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন আমার সেই ভালবাসা অমলিন রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করব না।

এই কটী কথা তোমাকে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যেখানেই থাকি না কেন, যাই করি না কেন, তোমার আশীর্ব্বাদ যেন দেহরক্ষীরূপে সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, বিপদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে, দুঃখে সান্ত্বনা দেয়।

সব সময় মনে রেখো, তোমার আমার এই বিচ্ছেদের মূলে আছে মহৎ একটা প্রেরণা, দেশের এবং দশের নিঃস্বার্থ কল্যাণের সম্ভাবনা। দেশের এবং দশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে আমরা কি পারি না আমাদের তুচ্ছ সুখ, শান্তি, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে ?

একদিন তুমিই আমাকে এ বাণী শিখিয়েছিলে, আজ নিশ্চয়ই সেটা কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বে তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ করব।

বিদায়, বিদায় প্রিয়তম, বিদায়....

সুনন্দা

বার বার চিঠিখানা পড়িয়াও বিশু বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, সুনন্দা সত্যই তাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। দুঃখে—ক্ষোভে তার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যে সুনন্দা বন্যার চেনটা কাটিয়া, লোকালয়ের দিকে ভাসাইয়া দিয়া তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে কি না আজ এইভাবে তাকে ছাড়িয়া যাইবে ?

চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে বিশু কতক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। আর কি এ জীবনে সে কোনদিনই সুনন্দার সাক্ষাৎ পাইবে না ? আর এইভাবে বিদায় লওয়ার অর্থই বা কি ? সাঙ্কো পাঞ্জার দুষ্ট অভিসন্ধিতে বাধা দিতে গিয়া সে যে আবার কোন নূতন বিপদে জড়াইয়া পড়িবে না, তাই বা কে বলিতে পারে ? অথচ কোথায় সে যাইবে, বিশু জানে না, জানিবার কোন সম্ভবনাই হয় ত নাই।

বিশু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল। সুনন্দার গন্তব্য স্থান নাই বা রহিল জানা, তা বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া সে বসিয়া রহিবে ? সুনন্দাকে ছাড়িয়া দিবে বিপদের মুখে ? কখনই না।

কখনই না। বিশু আপনমনেই বলিয়া উঠিল, সুনন্দার সঙ্গে দেখা আমি করবই। যে কোন প্রকারে হোক্‌. তার কাছে জেনে নেবো কি শপথ সে করেছে—যার জন্যে চিরকাল আমাদের মাঝে থেকে যাবে এই ব্যবধান। কে বলতে পারে, তার শপথের কথা জানতে পারলে আমি একটা প্রতিকারও করতে পারব না ?

আবার চিন্তা—গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বিশু স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কে জানে, সাঙ্কো পাঞ্জা নূতন উদ্যমে আবার কার সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে ? সুনন্দা চায় তাকে বাধা দিতে, আমারও উচিত পাশে দাঁড়াইয়া তার এই মহৎ কার্য্যে প্রাণপণ সহায়তা করা।

গেল, ট্রেণে সে চড়ে নাই, চড়িয়াছে জাহাজে। অতএব সন্ধান করিতে হইবে জাহাজেই।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় শরীর তার ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছিল। অথচ বাহিরে যাইতে হইলে লৌহশৃঙ্খলের বন্ধনটা আগেই খোলা দরকার। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইয়া সে শৃঙ্খল খুলিতে বসিল।

রাত্রি ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিতেছিল। পরিশ্রমে দেহ এলাইয়া পড়িতে চায়, কিন্তু বিশ্রাম করিবার অবসর কই ?

অতঃপর কি করিবে, ইতিপূর্ব্বে সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, মুক্ত হইয়াই রূপসজ্জা লইয়া বসিল।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘর হইতে বাহির হইল যখন, তখন তাকে বিশু বলিয়া চিনিবার কোন উপায়ই ছিল না। তার চেয়ে অল্পবয়স্ক তরুণ একটী যুবক, স্ফুর্ত্তি করিয়া বেড়ানোই যেন তার জীবনের উদ্দেশ্য।

আঠারো

পথে বাহির হইয়া বিশু ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল, কোন ট্যাক্সি পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হইল, ট্যাক্সিতে চড়া হয়ত নিরাপদ হইবে না। সে না চিনিলেও অধিকাংশ ড্রাইভার তাকে চেনে এবং তার এই পলায়নের সংবাদ হয়ত তাদের অবিদিত নাই।

পদব্রজেই সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটা বাড়ীর সামনে একটা ছোট গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে; এবং বাড়ীটার সদর দরজা বন্ধ। আশে-পাশে কোথাও কারও সাড়া নাই।

চারিদিকে ভাল করিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া সে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত গাড়ীটার উপর চড়িয়া বসিল এবং বাড়ীর নম্বরটা দেখিয়া লইতেও ভুলিল না।

পূর্ণ গতিতে গাড়ী চালাইয়া কিছুক্ষণ পরেই সে জাহাজ-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে নামিবার পূর্ব্বে একটা কথা তার মনে হইল, গাড়ীর মালিককে জানাইতে হইবে, গাড়ীটা সে চুরি করে নাই, অতি প্রয়োজনীয় কাজেই ব্যবহার করিয়াছে।

এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া গাড়ীর ভিতরেই সে একখানা চিঠির প্যাড আবিষ্কার করিল। তাতে মালিকটীর নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত ছিল।

গাড়ীর মালিক হৃষিকেশবাবুকে সম্বোধন করিয়া সে লিখিল :

মহাশয়, বিশেষ কোন অনিবার্য্য কারণে আপনার বাড়ীর সামনে থেকে ৭৭৭ সি নম্বর গাড়ীখানা আমি

ব্যবহার করবার জন্য নিয়েছিলুম। আশা করি, আপনি এটাকে চুরি বলে অভিহিত করবেন না। দু'একদিনের ভেতরই আপনার সঙ্গে দেখা করব এবং বুঝিয়ে বলব প্রয়োজনটা আমার কি।

গাড়ীখানা আপনি পাবেন জাহাজ-ঘাটের প্ল্যাটফরমের পাশে! আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য মার্জ্জনা না চাইলেও আশা করি, নিজের উদারতায় আপনি আমাকে মার্জ্জনাই করবেন।

আমার নামটাও অন্ততঃ যে আপনার অপরিচিত নয়, সে ভরসা আমার আছে বলেই ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি। ইতি

বিশু

চিঠিখানি লেখা শেষ করিয়া, একখানা খামের ভিতর ভরিয়া বিনা টিকিটেই সে জাহাজ-ঘাটের পার্শ্বস্থিত ডাক-বাক্সটায় ফেলিয়া দিল।

টিকিট-ঘরের সম্মুখে যখন সে আসিয়া পৌঁছিল, তখন ভোর হইতে বিলম্ব নাই। ঠিক সময়েই আসিয়াছে সে। আর একটু দেরী হইলেই হয়ত জাহাজটা ছাড়িয়া যাইত।

টিকিট ঘরের গবাক্ষটার সামনে আসিয়া সে বলিল, টিকিট, একখানা টিকিট স্যার....

রাত্রি জাগরণের জন্যই হৌক, অথবা অন্য কোন কারণেই হৌক, টিকিট-মাষ্টারটির মেজাজ বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই বিগড়াইয়া ছিল; শুষ্ক নীরস কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথাকার টিকিট?

জাহাজ আপনার যতদূর যাবে।

টিকিট আর দেওয়া হবে না, স্থানাভাব।

স্থানাভাবের কথাটা আপনাকে ভাবতে হবে না, জাহাজের ওপরেই হোক আর নিচেই হোক, আমার একটু ঠাঁই করে নিতে পারব। দয়া করে আপনি টিকিটটা দিন স্যার।

কিন্তু...

বিশু তাড়াতাড়ি পাঁচ টাকার নোট একখানা জানালার ভিতর গলাইয়া দিয়া বলিল, আপনাকে জল খেতে কিছু দিচ্ছি স্যার, দয়া করে আপত্তি করবেন না।

কোন্ ক্লাসের টিকিট চান আপনি?

যে ক্লাসের আছে আপনার। আশা করি স্থানাভাবের মত টিকেটাভাবও হবে না।

মাষ্টারটি মুখটা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া বলিলেন,তবে দিন হাজার টাকা ঘুস আর টিকিটের দাম তিনশো ছত্রিশ তেরো আনা। ঘুস দিলেই যদি টিকিট দেওয়া যেতো মশাই, তাহলে আর...

টিকিট দেবেন না আপনি?

বেশী বিরক্ত করেন ত টিকিটের বদলে যাতে হাতে হাতকড়া পরতে হয়, তার ব্যবস্থা করে দেবো।

ক্ষুদ্র গবাক্ষটী বিশুর মুখের উপরই বন্ধ হইয়া গেল!

বিশু মনে মনে কহিল, আমি আজ পলায়িত আসামী বলেই তুমি অতটা করতে সাহস করলে, নৈলে...

ধীরে ধীরে সে জাহাজ-ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সত্যই জাহাজে তিল ধারণের স্থান ছিলনা। চারিদিকেই একটা হৈ-চৈ, চেঁচামেচি, মহাত্রস্ত ব্যস্ত ভাব।

একটী ভদ্রলোক তখনও প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া গুণিয়া গুণিয়া মাল তোলাইতেছিলেন। বিশু তাঁর দিকে আগাইয়া গিয়া অতি বিনয়ের সহিত কহিল, মশায়ের যাওয়া হবে কোথা?

জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

লোকটী বিশুর কথার কোন জবাব না দিয়া ট্রাঙ্ক ও সুটকেসে তিন চারিটা একসঙ্গে একজন কুলির মাথায় চাপাইয়া দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সতেরো, আঠারো, উনিশ, কুড়ি....

হুড়মুড় করিয়া মাথার ট্রাঙ্ক ও সুটকেশগুলা ফেলিয়া দিয়া কুলিটী আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাপ্, মর্ গিয়া, মর গিয়া....

লোকটীও তার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আরে, আরে, কেয়া কিয়া তোম লোক? হামরা সব দামী দামী জিনিস-পত্তর—চুন-বিচূর্ণ কর্ দিয়া? আর একজন কুলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া মালগুলা জাহাজের উপর তুলিয়া লইয়া গেল।

জাহাজের দ্বিতীয় বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

লোকটী এবার আর কোনমতেই তাঁর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সব মাল এখনও তাঁর উঠে নাই, এখনি জাহাজ ছাড়িয়া দিবে, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া তিনি একবার প্ল্যাটফরমের উপর, আর একবার জাহাজের উপর ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

অবশিষ্ট কয়েকটা বাক্স ট্রাঙ্ক দুই হাতে তুলিয়া লইয়া বিশু বলিল, ভয় নেই আপনার, আমি তুলে দিচ্ছি।

লোকটী কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আপনাকে জাহাজের ভেতর যেতে দেবে না যে ?

সে ভার আমার। বলিয়া বিশু লাফ দিয়া জাহাজের উপর উঠিয়া পড়িল।

ভদ্রলোকটি তার পিছু পিছু গুণিতে গুণিতেই ছুটিলেন, একুশ, বাইশ, তেইশ....

তৃতীয় বাঁশী বাজিয়া উঠিতেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

মালগুলা বহন করিয়া লইয়া ভদ্রলোকটীর নির্দ্দেশে একটা কেবিনের সম্মুখে নামাতেই বিশু দেখিতে পাইল, ডেকের চেয়ারের উপর বসিয়া সুনন্দা।

উনিশ

মানব-দেহে প্রত্যেক বস্তুরই একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। প্রতুলের ধৈর্য্যও অসীম নয়, তারও পরিমাণ আছে। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুজাতার প্রতীক্ষায় দাঁডাইয়া দাঁড়াইয়া তাই সেও ক্রমে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সুজাতা সেই যে অপলক দৃষ্টিতে দিকে তাকাইয়াছিল, একটু নড়িল না বা একটীবার মুখও তুলিল না—যেন পাথরে গড়া মূর্ত্তি!

শীতের কন্‌কনে বাতাস তার আর্দ্র বস্ত্রের উপর দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তবু ভ্রূক্ষেপ নাই।

রাত হয়ত তখন বড় বেশী বাকি ছিল না, হঠাৎ দেখা গেল পাষাণে যেন প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। সুজাতা পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে একটা আলোক স্তম্ভের পাশ দিয়া যাইতেই—প্রতুলের নজরে পড়িল, মুখখানায় তার নিদারুণ ক্লান্তি ও বেদনার ছায়া সুপরিস্ফুট।

সুজাতা যে কোথায় যাইতেছে, প্রতুল জানিল না, অন্ধের মতই তার অনুসরণ করিতে লাগিল।

বেশীদূর যাইতে হইল না, পথপার্শ্বে একটা হোটেলের দ্বারে সুজাতা সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল, প্রতুলও দাঁড়াইল।

হোটেলের সম্মুখে মূল্যবান একখানা মোটর দাঁড়াইয়াছিল, প্রতুলের মনে হইল, সুজাতাদের। তাই যদি সত্য হয়, তা হইলে এটাও নিঃসন্দেহে

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, সুজাতা আসিয়াছিল সাঙ্কো পাঙ্গার গঙ্গা-গর্ভস্থ আবাসে তার সহিত দেখা করিতে, গাড়ীখানা এখানেই অপেক্ষা করিতেছিল।

পরক্ষণেই প্রতুলের মনে হইল, গাড়ীখানা যদি সত্যই সুজাতার হয়, তা হইলে এবার সে আর পদব্রজে যাইবে না। একটা ট্যাক্সি লইয়া সুজাতাকেও তার অনুসরণ করিতে হইবে। তার পূর্ব্বে....

চিন্তার অবসর ছিল না। প্রতুল তাড়াতড়ি ছুটিল নদীতীরে পরিত্যক্ত তার জামা-কাপড়গুলা পরিধান করিতে।

সুজাতা তখন গাড়ীতে চড়িয়া বসিয়াছে। প্রতুলও সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিল।

সুজাতার গাড়ী ছুটিল। প্রতুলের ট্যাক্সিখানাও সমান দূরত্ব রাখিয়া তার পিছু পিছু ধাবিত হইল।

লোকালয় ছাড়িয়া গাড়ী ক্রমশঃ নির্জ্জন পথ ধরিয়া চলিল। প্রতুল বুঝিতে পারিল না, সুজাতার গন্তব্যস্থান কোথায়।

কিন্তু এ উৎকণ্ঠার মধ্যে তাকে আর বেশীক্ষণ থাকিতে হইল না। অদূরেই একটা পেট্রলের দোকান—সুজাতার গাড়ীখানা সেখানে ধীরে, ধীরে প্রবেশ করিল।

পেট্রোল লইয়া গাড়ীখানা বাহির হইয়া যাইতেই প্রতুলও উপস্থিত হইল সেখানে। চাকরটা আসিতেই প্রশ্ন করিল, ক'গ্যালন তেল নিলেন ওঁরা ?

মোটে দু' গ্যালন বাবু! অত বড় গাড়ী, ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই ত দু' গ্যালন কাবার হয়ে যাবে।

কাছাকাছি যাবেন কি না....

হ্যাঁ, ওই ত বললেন, জাহাজ-ঘাটে। ও রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হ'ত, তাই আমি এই সামনের রাস্তাটা বাতলে দিলুম কিনা...

শুনিবার মত আর কিছু ছিল না। প্রতুল তাই বলিয়া উঠিল, আমাকে দাও এক গ্যালন, খুব তাড়াতাড়ি....

তেল ভরিতে ভরিতে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ওঁনার সঙ্গে যাবেন নাকি ?

প্রতুল সংক্ষেপে জবাব দিল, হ্যাঁ।

তাহলে কেন বাবু, ওই গাড়ীটাতেই আপনি গেলেন নি ? এক খরচেই হ'ত...

এ কথার কোন জবাব না দিয়া প্রতুল তাড়াতাড়ি দুটি টাকা তার হাতে দিয়া বলিল, তেলের দাম আর বাদ বাকী তোমার বকশিস্....

ট্যাক্সিখানা উল্কাগতিতে ছুটিয়া গিয়া পুনরায় মোটরখানার পিছু ধরিল। প্রতুল বলিল, আর পিছু নয় ড্রাইভার, এবার চল এগিয়ে। শিগগির পার, জাহাজ-ঘাটে পৌঁছে দাও আমাকে। মোটা বকশিস্ মিলবে।

ড্রাইভার মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া গাড়ীর গতি বাড়াইয়া দিল।

সুজাতার গাড়ীখানা অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় পাছে সে দেখিতে পায়, সেইজন্য প্রতুল সিগারেটের ধোঁয়ায় বদ্ধ গাড়ীখানা ভরাইয়া ফেলিল।

দ্রুতগতিতেই গাড়ী অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল পথের পাশে একটি লোক দাঁড়াইয়া হাতের ইঙ্গিতে গাড়ীটা থামাইতে বলিতেছে।

কিছু না বুঝিয়া প্রতুল ড্রাইভারকে আদেশ দিল, থামাও গাড়ী।

গাড়ী থামিতেই লোকটী সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, এই যে—এসে গেছেন দেখছি। মেয়েটিও গাড়ীতে আছেন ত?

প্রতুল বুঝিল, লোকটি সুজাতারই সন্ধান করিতেছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কড়া সুরে সে কহিয়া উঠিল, ওহে শোন। কোন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধে অপরিচিত লোকদের সঙ্গে এভাবে কথা কইতে তোমায় কে শিখিয়েছে বল ত?

কথার উত্তর দিবে কি, লোকটি নির্ব্বোধের মত হাঁ করিয়া প্রতুলের দিকে তাকাইয়া রহিল।

প্রতুল পুনরায় কহিল, তুমি কি মনে কর, এভাবে কথা কইলেই মনিবের হুকুম মানা হবে, না এভাবে কাজ করলে তিনি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন?

তথাচ লোকটি কোন জবাবই দিল না। নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া এবার সে মাথা নোওয়াইল।

আন্দাজে ছোড়া ঢিলটা যথাস্থানেই আঘাত করিয়াছে দেখিয়া প্রতুল মনে মনে খুসী হইয়া পুনরায় বলিল, বেশ, আমি তাহলে জানাইগে, সুন্দরভাবে তুমি তাঁর হুকুম তামিল করছ?

লোকটি এবার যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হাত দুটা জোড় করিয়া অনুনয়ের সুরে কহিল, দোহাই আপনার, এবারের মত মাপ করুন। ও কথা বললে তিনি আর আমাকে আস্ত রাখবেন না, এখুনি কুমীর হয়ে গঙ্গার জলের ভেতর টেনে নিয়ে যাবেন....

বেশ, তাহলে তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।

লোকটি কাকুতিভরা কণ্ঠে কহিল, শুধু দাঁড়িয়েই থাকব? ওঁকে জাহাজে তুলে দোব না?

তা ত দিতেই হবে, নৈলে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছি কেন?

কিন্তু ওদিকে যে 'নটিনী' ছাড়বার সময় হয়ে এল....

সে ভয় যদি থাকে, তাহলে উঠে এস গাড়ীতে।

গাড়ীতে যাব?

হ্যাগো, গাড়ীতে আসবে! কথা শুনতে তুমি ত বড় দেরী করো দেখছি!

লোকটি আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ভিতরে একবার তাকাইয়া লইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, ওঁকে ত কই দেখছি না? আসবার কথা ছিল যে ঠিকই।

প্রতুল গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, আসছেন তিনি ঠিকই, তবে এ গাড়ীতে নয়, আমাদের পিছনে। সমস্ত কথা এবার খুলে বল দিকিন তুমি।

লোকটি থতমত খাইয়া বলিল, কি বলব?

বলবে তোমার কথা, তোমার মনিবটির কথা।

তাহলে কি আপনি....

তাকে আর বলিতে না দিয়া প্রতুলই বলিয়া উঠিল, না, না, আমি তোমার মনিবের দলের কেউ নই। আমি ..আমি....চেনো না আমাকে?

আজ্ঞে...ঠিক....

আমি প্রতুল লাহিড়ী।

লোকটি হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মনিব আমার জলের কুমীর, আর আপনি ডাঙ্গার বাঘ!

বাঘেরহাতে পড়েছ যখন, তখন নিস্তার যে নেই, বুঝতেই ত পারছ ? কিন্তু তোমায় আমি মুক্তি দেবো....

মুক্তি দেবেন ?

নিশ্চয়ই, যদি তুমি আমার সঙ্গে থাক, আমাকে সাহায্য কর।

লোকটি ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে আমাকে ?

প্রতুল জবাব দিল, কাজ বিশেষ এমন কঠিন নয়, ওই 'নটিনী' জাহাজেই যাব আমি, তুমি আমাকে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে, জনপ্রাণীও যেন টের না পায়।

কুড়ি

গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ঢেউ কাটিতে কাটিতে 'উর্ম্মি'-জাহাজখানা দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হইতে লাগিল। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন শ্বেতহংসী একটি জলের উপর দিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে।

মোট নামাইয়া দিয়া ডেকের দিকে অগ্রসর হইতেই বিশু অবাক্ হইয়া দেখিল, চেয়ার খালি, সুনন্দা নাই। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে কোথায় অদৃশ্য হইল সে? বুক ঠেলিয়া বিশুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস একটা বাহির হইয়া আসিল।

এত বড় জাহাজ—চট্ করিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য; তার উপর অবাধ ভ্রমণে অধিকার তার নাই, জাহাজে উঠিয়াছে সে বিনা টিকিটে। হঠাৎ যদি ধরা পড়িয়া যায়, সমস্তই পণ্ড হইবে।

বিশু স্থির করিল, সর্ব্বাগ্রে নিজেরই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে সে, 'রপর সুনন্দার সন্ধান। ধীরে ধীরে কাপ্তেন সাহেবের ঘরের দিকে সে গ্রসর হইল।

একবার তার মনে হইল, মিঃ মিত্রের মত কাপ্তেন সাহেবও যদি তাকে পাগল বলিয়া স্থির করেন? তা হইলে কোন উপায়ই থাকিবে না। এবারে ভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ ই নির্ভর করিতে হইল তাকে।

কাপ্তেন তাঁর নিজের কেবিনের ভিতর কি একটা প্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

সরাসরি তাঁর সম্মুখে গিয়া বিশু অভিবাদন করিল।

কাপ্তেন তার দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইতেই কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া সে সুরু করিল, আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও, আশা করি, নাম বললে নিশ্চয়ই আমাকে আপনি চিনতে পারবেন। আমার নাম বিশু—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—'বিশ্বদূত' পত্রিকার একজন প্রধান সাংবাদিক আমি, আর সুবিখ্যাত গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ীর ছোট ভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। বর্ত্তমানে সান্ধো পাঞ্জাকে মুক্তি দেওয়ার অপরাধে আমার নামে ওয়ারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। পুলিস-কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে মস্ত বড় একটা ভুল যে করেছেন, জানতে বোধ হয় আপনার বাকি নেই? সেই জন্যে আত্মরক্ষা করার অভিপ্রায়ে এবং আরো একটা বিশেষ প্রয়োজনে (প্রয়োজনটার কথা এখনিই বলছি) আপনার জাহাজে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি। সময় অভাবে টিকিটও কাটতে পারিনি, অবিশ্যি তার টাকাটা আমার কাছেই আছে। এখন প্রয়োজনটার কথা বলি।

সত্য মিথ্যায় জড়াইয়া আদ্যোপান্ত ঘটনাটা কাপ্তেনের নিকট বিবৃত করিয়া অবশেষে বিশু কহিল, সুনন্দা নামে যে মহিলাটীর কথা এইমাত্র আপনাকে বললুম, বিশেষ কোন প্রয়োজনে তিনি এই জাহাজেরই যাত্রী। তাঁরই সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। কিন্তু সে পথে বাধা অনেক। প্রথমতঃ পুলিস, দ্বিতীয়তঃ জাহাজের আইন কানুন তবে আপনার সাহায্য পেলে কিছুই যে আমার আটকাবে না, তা আমি জানি। বলিয়াই বিশু একবার তার শ্রোতাটীর দিকে করুণ নেত্রে তাকাইল।

কথাগুলা যে কাপ্তেনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, প্রথম দর্শনেই বিশু তা বুঝতে পারিল এবং বুঝিতে পারিয়াই সে পুনরায় কহিল,

আমার সব কথাই আপনাকে আমি খুলে বললুম। এবার হয় আপনি আমাকে সাহায্য করুন, নৈলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিন। কোনটাতেই আপত্তি নেই আমার।

কাপ্তেন [illegible] বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়া বিশু পুনরায় কহিয়া উঠিল, আমাকে সহায়তা করার জন্যে যদি কোন রকম প্রতিশ্রুতি চান আমার কাছে, তা দিতে আমি রাজী।

কাপ্তেন বলিল, প্রতিশ্রুতি অবশ্যি একটা দিতেই হবে আপনাকে....

বিশু ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সেটা কি জানতে পারি?

আমার কথামত কাজ করতে হবে।

আপনার কথামত? কিন্তু তাতে আমার কার্য্যসিদ্ধির...

অসমাপ্ত কথাটা তার শেষ করিলেন কাপ্তেনই। বললেন, কোন বাধা হবে না। আপনাকে যে কেবিনটায় থাকতে বলব, সেখানেই আপনি থাকবেন। মানে আপনাকে আমি...

বন্দী করে রাখতে চান, এই ত? বেশ, তাতেই আমি রাজী, আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিলুম।

এটা কি আপনার ছদ্মবেশ?

বিশু হাসিতে হাসিতে কহিল, আপনার কি মনে হয়?

ছদ্মবেশই। ছদ্মনামটা আপনার?

আপনি কি বলেন?

বিপ্রদাস।

বেশ, তাই।

ছদ্মবেশের সাজ-সরঞ্জাম সব সঙ্গে এনেছেন আপনি?

কতক এনেছি।

বেশ, তা হলেই চলবে। সর্ব্বদা স যেন আপনাকে চিনতে না পারে।

অশেষ ধন্যবাদ—এ ঋণ আপনার কে... আমি শোধ করতে পারব না।

কাপ্তেন আগ্রহের সহিত বলিলেন, কিন্তু আমি ভেবে নেবো শোধ হয়ে গেছে ব'লে—যে দিন আপনারা দুই বন্ধু মিলে সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দেবেন।

আধ ঘণ্টাটাক পরে।

বিশু তার জন্য নির্দ্দিষ্ট তিন নম্বরের কেবিনটায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, এবার কর্ত্তব্য কি তার? প্রকাশ্যেই সে সুনন্দার সহিত দেখা করিবে, না গোপনে থাকিয়া তার উদ্দেশ্যটা জানিয়া লইবে? এখন তার যে ছদ্মবেশ—হয়ত সুনন্দা ছাড়া আর কেহই তাকে চিনিতে পারিবে না। কিন্তু কাপ্তেন? সেটাও একটা সমস্যা।

কাজ নেই, বিশু নিজের মনেই কহিয়া উঠিল, ছদ্মবেশ ধরাই ভাল, যাতে কাপ্তেন সাহেবও আর না চিনতে পারেন। সুনন্দা নিশ্চই তার কেবিনে চুপটি করে বসে থাকবে না, লাইব্রেরীতেও আসতে পারে, বা খেলাধুলো দেখ্‌তেও যেতে পারে। ওসব জায়গাতেই তার সঙ্গে দেখা করা ভালো।

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিশু কেবিন হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথমেই আসিল সে লাইব্রেরী ঘরে। টেবিলের উপর নানা ভাষার

খবরের [illegible] , তারই একটা তুলিয়া লইয়া পড়িবার অছিল [illegible] মেলিয়া ধরিল।

খ [illegible] লে থাকিয়া দৃষ্টিটা তার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়া [illegible]

ঘরের এক [illegible] সিয়া যে লোকটী সন্দিগ্ধ নয়নে বিশুর এই কার্য্য-কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল.তার দিকে নজর পড়িতেই মনে হইল, হয় সে জাহাজেরই কোন কর্ম্মচারী, কাপ্তেনের নির্দ্দেশানুযায়ী তার দি[illegible] দৃষ্টি রাখিয়াছে।

সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেই বিশুর নজরে পড়িল, তারই মত খবরের কাগজ একখানা হাতে লইয়া অদূরের ওই টেবিলটার ধারে বসিয়া আছে সুনন্দা। সেও এতক্ষণ বিস্ময়ভরা চোখে বিশুর দিকেই তাকাইয়াছিল।

চারি চোখের মিলন হইতেই সুনন্দা এমনিই ভাবে চমকিয়া উঠিল যে, বিশুর দৃষ্টিতে তা এড়াইল না।

সুনন্দা যে তাকে চিনিতে পারিয়াছে, এ বিষয়ে বিশুর আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না। কাগজখানায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে অধীর আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, সুনন্দা কখন বাহির হইবে।

কয়েক মুহূর্ত্ত—তারপরই কাগজখানা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া সুনন্দা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশুর সহিত আবার তার দৃষ্টি বিনিময় হইল।

বিশু সে দৃষ্টির অর্থ করিল, ইঙ্গিতে সুনন্দা তাকে আহ্বান করিতেছে।

ঘর হইতে বাহির হইতে হইলে বিশু যেখানে বসিয়াছিল, সে স্থানটা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সুনন্দা সেদিকে অগ্রসর হইতেই বিশু মনে করিল, সে বুঝি তারই দিকে আসিতেছে; কিন্তু সুনন্দা তার দিকে একবার তাকাইলও না, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিশুর বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এ কি কাণ্ড! সুনন্দা তাকে এমনিভাবে উপেক্ষা করিয়া গেল কেমন করিয়া? বুকে তার একটুও বাজিল না!

কিন্তু বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে না তার। সুনন্দাকে অনুসরণ করিতে হইবে, তার কেবিনটাও অন্ততঃ চিনিয়া রাখা প্রয়োজন। সুনন্দার পিছু পিছুই সে বাহির হইয়া আসিল।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুনন্দা ক্ষিপ্রপদে তার কেবিনের দিকে অগ্রসর হইল, পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইল না।

বিশু যখন কেবিনটার সামনাসামনি আসিয়াছে, বিদ্যুতের গতিতে সে ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

বিশু মনে করিল, এত লোকের মাঝখানে সুনন্দা নিশ্চয়ই লজ্জা পাইয়াছে, তাই তার অন্তরাল প্রয়োজন। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া নিশ্চয়ই সে তার জন্য অপেক্ষা করিবে!

কিন্তু ধারণাটা যে তার সম্পূর্ণ নিরর্থক—দরজার উপর মৃদু চাপ দিতেই সে বুঝিতে পারিল।

দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

কতক্ষণ গুম হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কি যে করা উচিত? ফিরিয়া যাইবে? না। দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিবে? তাও সম্ভব

নয়। তবে? সুনন্দা যতক্ষণ না পুনরায় বাহির হয়, ততক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিবে? তাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইল না।

অবশেষে কোনো উপায় আর খুঁজিয়া না পাইয়া বিশু দরজার উপর মৃদু করাঘাত করিতে লাগিল।

ঘরের ভিতর শোনা গেল মৃদু পদশব্দ।

বিশুর মন আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল! সুনন্দা আসিতেছে অভ্যর্থনা করিতে।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। কিন্তু একি!....

সুনন্দার পরিবর্তে ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া কপিঞ্জল। হাতদুটি জোড় করিয়া বিশুকে নমস্কার করিতেছে।

বিশু তাকে প্রত্যভিবাদন করিল না, এমনই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। এই কপিঞ্জলই কি তাকে সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল না? তবে? সুনন্দা যে জাহাজে করিয়া পলায়ন করিতেছে, সেই জাহাজে সে আসিল কি করিয়া? তবে সেই কি সুনন্দাকে লইয়া যাইতেছে?

হতচকিতের মতই বিশু ধীর পদে অগ্রসর হইয়া কেবিনের ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরে আসবাব-পত্রের বিশেষ কোন বাহুল্য ছিল না। প্রকাণ্ড একটা সিন্দুকই কেবল বিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

প্রথমে কথা কহিল কপিঞ্জলই! বলিল, আপনাকে এতক্ষণ বসতে

বলিনি বলে মাপ করবেন বিশুবাবু! বসুন। আমার ব্যক্তব্যটা খুবই সংক্ষিপ্ত। আপনার একান্ত পরিচিত সেই প্রাণীটীর অনুরোধ....

কে সে? সুনন্দা? বিশুর কণ্ঠস্বর শুষ্ক।

সে কথার কোন জবাব না দিয়া কপিঞ্জল তাঁর পূর্ব্ব কথারই জের টানিয়া বলিল, তাঁর অনুরোধ, তিনি যে এই জাহাজে আছেন, ভুলে যান আপনি। আপনার জীবন যাতে বিপন্ন না হয়, সেজন্যে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা, এমন ছদ্মবেশ ধারণ করুন আপনি, যাতে তিনিও যেন আপনাকে চিনতে না পারেন।

বিশু ক্রোধ-অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যার কথা, আমি শুনতে চাই তারই মুখে।

কপিঞ্জল শান্ত মুখেই বলিল, কিন্তু তিনি ত আপনার সঙ্গে...

দেখা করবেন না, কেমন, এই ত? হঠাৎ পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া লইয়া কপিঞ্জলের ললাট-লক্ষে উদ্যত করিয়া বিশু বলিল, এই মুহূর্ত্তে যদি আপনি সুনন্দার সঙ্গে দেখা করবার পথ বলে না দেন, গুলি করতে বাধ্য হব আমি।

কপিঞ্জল নির্ব্বিকার মুখেই কহিল, অসম্ভব।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল, আপনার পক্ষে যেটা অসম্ভব, আমি তা এখনি সম্ভব করে নোব!

আমি শপথ করে বলছি....

আপনার শপথে আমি বিশ্বাস করি না।

কিন্তু....

দাঁড়ান, আমার কথাটা আগে শেষ করে নিই। জানি না কে আপনি,

আর কি-ই বা আপনার কাজ। কিন্তু আমি আপনাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিচ্ছি, সুনন্দার সঙ্গে আমি দেখা করবই।

কপিঞ্জল দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, পারবেন না।

বিশু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, পারব না? পারব না বলে কোন কথা....

তাকে শেষ করিতে না দিয়াই কপিঞ্জল কহিয়া উঠিল, পারলেও আমি হ'তে দেবো না।

বিশু হাসিয়া উঠিল। কহিল, আপনি হতে দেবেন না। আপনি তখন থাকবেন কোথায় শুনি?

আপনি কি আমাকে হত্যা করবেন?

না, গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে সম্প্রতি হত্যাকারীর কাজটা বেছে নেবার আগ্রহ আমার নেই। আমি আপনাকে ওই সিন্দুকটার ভিতর আবদ্ধ ক'রে রাখব—চাবি বন্ধ করে।

সাহায্যের জন্য আমি চীৎকার করব।

বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল, অত সহজেই! আপনি কি মনে করেছেন, সে পথ বন্ধ না করে সিন্দুকের ভেতর আপনাকে আটকে রাখব?

কপিঞ্জলের মুখে ফুটিয়া উঠিল কঠিন একটা হাসির রেখা, বিশু তা লক্ষ্য করিল না। পিস্তলটা উদ্যত রাখিয়াই সে আদেশের সুরে কহিল, যান—সিন্দুকের ভেতর যান আপনি....

সশস্ত্র বিশুর আদেশ পালন ছাড়া নিরস্ত্র কপিঞ্জলের কোন উপায়ই

ছিল না আর। ধীরে ধীরে সে সিন্দুকের ডালাটা তুলিয়া তার ভিতর প্রবেশ করিল।

বিশু পুনরায় কহিল, শুয়ে পড়ুন....

কপিঞ্জল বিনা আপত্তিতেই শুইয়া পড়িল।

শক্ত বাঁধনে তার হাত মুখ বাঁধিয়া, সিন্দুকের ডালাটা ফেলিয়া দিয়া বিশু তালাবন্ধ করিয়া দিল।

সুনন্দার সন্ধানে এবার আর কোন প্রতিবন্ধক নাই ভাবিয়া খুসীমুখেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সামনেই পড়িয়া গেলেন কাপ্তেন। মুখে চোখে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার ভাব। বিশু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দেখুন, আমি একবার...

বাধা দিয়া কাপ্তেন কহিয়া উঠিলেন, মাপ করবেন বিপ্রদাসবাবু, এখন কোন কথা শোনবারই সময় নেই আমার। মাইল কুড়ি দূরে 'নটিনী' বলে একটা জাহাজ হঠাৎ বিপন্ন হতে বসেছে। বেতারে তারা এখনিই আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছে। এখনিই যেতে হবে সেখানে....

মুহুর্ত্তের মধ্যেই কাপ্তেন অদৃশ্য হইলেন।

বিশু স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে জানিত না, নটিনীর এই আকস্মিক বিপদের অন্তরালে কত না রহস্যই লুক্কায়িত রহিয়াছে।

কাপ্তেনের সাহায্য ছাড়া সমস্ত জাহাজটা অনুসন্ধান করিয়া দেখা যে কোনমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না, বিশু তা জানিত এবং জানিত বলিয়াই সে একেবারে মুষড়িয়া পড়িল। সহায়তা করা দূরে থাক, একটা কথা শুনিবারও অবসর কাপ্তেনের নাই।

সহসা তার মনশ্চক্ষুর সামনে ভাসিয়া উঠিল, বিপন্ন একটা জাহাজ—তার অসহায় আরোহীদের আর্ত্ত ব্যাকুল মুখ—সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনটাও তার তুচ্ছ হইয়া গেল। এত বড় একটা বিপদে কাপ্তেনের সহায়তা করা তারও যে উচিত—এই কথাটাই বড় হইয়া দেখা দিল। সুনন্দার সন্ধানে বিলম্ব ঘটিলে হয়ত কোন ক্ষতিই হইবে না, কিন্তু জাহাজ রক্ষায় তিলার্দ্ধ সময়ের অপচয় হইলে সহস্র সহস্র প্রাণীর জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিবে।

কিন্তু সুনন্দার কথা মনে হইতেই সে পুনরায় অধীর হইয়া উঠিল। কেন দেখা করিতেছে না সে? কপিঞ্জল এইমাত্র তাকে যে কথাগুলা বলিল, সত্যই কি সুনন্দা বলিয়াছে, না নিজের সার্থসিদ্ধির জন্য তারই রচা কথা?

মন বলিয়া উঠিল, এমন কথা সুনন্দা কখনই বলিতে পারে না, নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কপিঞ্জলের কোন গুপ্ত অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে।

চিন্তার কোন মীমাংসা করিতে না পারিয়া নটিনী এবং তার আরোহী-দের বিশু অভিসম্পাত দিতে লাগিল। বিপন্ন হইবার কি সময় ছিল না আর? সমস্ত কার্য্যই তার পণ্ড করিয়া দিল।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে নিজেই বিস্মিত হইল, তার চিন্তাধারার এই অধোগতি দেখিয়া। সহস্র সহস্র প্রাণীর বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া সে কিনা নিজের স্বার্থ টাকেই এত বড় করিয়া দেখিতেছে? অভিসম্পাতটা যে তারই প্রাপ্য।

নিজেরই উপর নিজে ক্রুদ্ধ হইয়া, নিজেকেই অভিশাপ দিতে দিতে, বিশু ছুটিল যতদূর পারে বিপন্ন যাত্রীদের সাহায্য করিবার জন্য নিজেকে নিয়োগ করিতে।

ডেকের দিকে অগ্রসর হইতেই দেখা গেল, সর্ব্বত্রই কার্য্যতৎপরতার সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট। বড় বড় শতরঞ্চি পাতা হইতেছে, চাদর বিছানো হইতেছে, আহত যাত্রীদের যে কোন অবস্থায় পাওয়া যাক না কেন, এখানে শোয়াইয়া তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা সুরু করা হইবে।

ডাক্তারদের ভিতরও অসম্ভব ব্যস্ততা। প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী এবং ঔষধ-পত্রাদি তাঁরা হাতের নিকট সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন।

অপর দিকে নাবিক ও খালাসীদের ব্যস্ততারও আর অন্ত নাই। জাহাজের মাল নামাইবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই তাদের প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইতেছে। লঞ্চটিতে যদি আগুন লাগিয়া থাকে, অথবা যদি তার জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনাই দেখা যায়, তা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তার আরোহীদের সহিত মালগুলাও স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

বিশু লক্ষ্য করিল, যার জন্য এত আয়োজন, তার প্রকৃত অবস্থাটা যে কি কেহই বলিতে পারে না। যাকেই জিজ্ঞাসা করিতে যায়, সেই প্রশ্ন করিয়া বসে, জাহাজখানার কি হয়েছে মশাই? জল নেই, ঝড় নেই, কি এমন বিপদ হতে পারে? তবে কি আগুন লেগেছে?

বিশু অবাক্ হইয়া গেল। যে জাহাজের সাহায্যের জন্য তারা অগ্রসর হইতেছে, তার বিপদের প্রকৃতিটা যে কি, কেহই জানে না, এমন কি ঊর্ম্মির কর্তৃপক্ষীয়েরাও না। আশ্চর্য্য!

কৌতূহল দমন করিতে গিয়া অনেক কষ্টে বিশু কেবল এইটুকুই আবিষ্কার করিল, কাপ্তেন বেতারে সংবাদ পাইয়াছেন, নটিনী বিপন্ন, তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে।

জাহাজ খুব দ্রুতগতিতেই চলিতেছিল।

অবশেষে নটিনী দৃষ্টিগোচর হইতেই কেহ কেহ ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওই যে আগুন—আগুন লেগেছে হে!

কেহ তার প্রতিবাদ করিল, কোথায় আগুন? আগুন লাগলে জাহাজ কখন ও-রকম অবস্থায় থাকে?

আর একজন মন্তব্য প্রকাশ করিল, না, না, নিশ্চয়ই তলাতে কোথাও মস্ত বড় ফুটো হয়ে গেছে, ডুববে—এখনিই জাহাজটা ডুববে

নটিনীর আরও নিকটবর্ত্তী হইতেই দেখা গেল, ডেকের উপর একখানা কালো বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে :

সমুদ্র-তীর থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখো

যতদূর সম্ভব আমাদের নিকটবর্ত্তী হও

জাহাজ থেকে মইগুলো নামিয়ে দাও

আমরাও নৌকা জলে নামাচ্চি

বিজ্ঞাপনটার দিকে সকলেরই দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু আসল ব্যাপারটা তখনও কেহ বুঝিতে পারিল না।

নটিনী নিস্তব্ধ, তার আরোহীদের মাঝেও কোন চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত

হইল না। সকলেই আশ্চর্য্য হইল এই ভাবিয়া, যাদের বিপদের আভাস পাইয়া 'ঊর্ম্মি' ছুটিয়া আসিয়াছে, তারা নিজেরাই জানে না তাদের বিপদের পরিমাণ কি এবং কতটুকু!

ঊর্ম্মির আরোহীদের বিস্মিত দৃষ্টির মাঝেই দেখা গেল, নটিনীতে একটা পতাকা উত্তোলিত হইতেছে। পতাকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই যারা তার অর্থ বুঝিতে পারিল, তারা প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল; যারা বুঝিল না, সহসা এই আর্ত্তনাদের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভয়পাংশু মুখে পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত পতাকাটীর উপর একটা নরকঙ্কাল অঙ্কিত দেখিয়াই বিশু বুঝিতে পারিল, ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, মৃত্যু অর্থাৎ যাদের জন্য এই পতাকা উত্তোলিত হইতেছে, তাদের সকলেই অবিলম্বে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে।

ঊর্ম্মির যাত্রীর সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, জলদস্যু! জলদস্যু!

সহসা তাদের আর্ত্তকণ্ঠ ছাপাইয়া কয়েকটা পিস্তল একসঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল, গুড়ুম—গুড়ুম....

ডেকের জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যারা অতিমাত্রায় সাহসী, তারা শুধু দাঁড়াইয়া রহিল পরবর্ত্তী ঘটনার প্রতীক্ষায়।

নটিনীর ছাদের দিকে তাকাইতেই বিস্ময়ে—আতঙ্কে বিশুর বুকের রক্ত চমক খাইয়া উঠিল। সেখানে দাঁড়াইয়াছিল আপাদমস্তক কৃষ্ণ বস্ত্রে আবরিত একটি প্রাণী...কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত সাঙ্কো পাঞ্জার এই মূর্ত্তি বিশুর অপরিচিত নয়।

কি অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা তার কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে চায়—ভাবিয়া বিশু অবাক হইয়া গেল। বেতারে উর্ম্মিকে এরূপভাবে সঙ্কেত করিয়াছিল সে, সন্দেহ সংশয়ের কথা দূরে থাক্, এমন কেহ নাই যে তার বিপদে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিবে না।

একমাত্র সাঙ্কো পাঞ্জা ছাড়া এরূপ চাতুর্য্য—কেহ কোনদিন কল্পনায় আনিতে পারে না। হয়ত আর কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে উর্ম্মির ধন-রত্ন অপহরণ করিয়া তার আরোহীদের হত্যা করিবে, অথবা জাহাজটা জলমগ্ন করিয়া দিয়া বিজয় গর্ব্বে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে।

জাহাজের ছাদের উপরেই দাঁড়াইয়া সাঙ্কো পাঞ্জা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উর্ম্মির আরোহী যারা নিরস্ত্র হয়ে সকলেই ওপরের ডেকে এসে দাঁড়াও। আমার আদেশ যদি কেউ অমান্য করে, তার শাস্তি মৃত্যু! জাহাজের কর্ম্মচারী যারা, তারাও সকলে দাঁড়াও এক জায়গায়। জলে আমি নৌকো ভাসাচ্ছি, যারা বাঁচতে চাও, শীগ্‌গির এসে ওঠো। এর পর কারো জীবনের জন্যে আর আমি দায়ী নই।

সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ-বাণী প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ভিতর হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সকলেই চায় সর্ব্বাগ্রে নৌকায় উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইতে।

বিশুর মনে সুনন্দার কথা আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায় সে? কি অবস্থায় আছে? যে কোন প্রকারেই হোক্, খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তাকে। প্রতি মুহূর্ত্তেই যে তার জীবনসংশয়,

বুঝিতে বিশুর বাকী ছিল না। লুণ্ঠনকারীদের সকলেই ত খাঁরি সুনন্দাকে সাঙ্কো পাঞ্জার কন্যা বলিয়া চেনে না?

কোন দিকে আর না তাকাইয়া, কারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতপদেই বিশু সুনন্দার কেবিনটার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনে মনে সে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল, এবার যদি কাপিঞ্জলের নিকট হইতে সুনন্দার সন্ধান না পায়, তাহইলে সে তাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলিয়া বিশু ভিতরে প্রবেশ করিতেই কে বলিয়া উঠিল, এসো, তোমার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছি।

কণ্ঠস্বর সুনন্দার।

অধীর উত্তেজনায় বিশু চীৎকার করিয়া উঠিল, সুনন্দা!

তার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সুনন্দা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, আমি। যা ভয় করেছিলুম, তাই ঘটতে চলেছে। গণ্ড দিয়া তার ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিশু সেদিকে লক্ষ্য করিল না। নিজের খেয়ালেই বলিয়া চলিল, আর কোন কথা বলবার আগে, আমাকে শুধু বল সুনন্দা, কেন তুমি এই জাহাজে উঠেছ? অমূল্য তোমার এই জীবন—কি জন্যে তুমি নষ্ট করতে বসেছ? পারবে তুমি সাঙ্কো পাঞ্জার সঙ্গে সংগ্রাম করতে?

অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠে সুনন্দা জবাব দিল, আমি এই জাহাজে উঠেছি, যদি পারি প্রাণ দিয়ে এর আরোহীদের বাঁচাতে।

বিশু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিল, কিন্তু কতটুকু শক্তি,

তোমার? এই নিরীহ আরোহীদের বাঁচাতে গিয়ে নিজেরই জীবন বিপন্ন করে তুলবে তুমি।

আর্দ্র চোখদুটী বড় বড় করিয়া সুনন্দা গভীর হতাশার সহিত কহিল, তা বলে আমি সব জেনে শুনে চুপ করে বসে থাকব?

সুনন্দার আরও কাছে আসিয়া বিশু দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, কি করতে চাও, বল....

তার হাতদুটা সহসা ধরিয়া ফেলিয়া সুনন্দা অনুনয়ের সুরে কহিল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে তুমি?

অনুরোধ! কি অনুরোধ তোমার সুনন্দা?

ওই সিন্দুকটার ভেতর তোমায় লুকিয়ে থাকতে হবে, লক্ষীটী!

বিস্মিত বিশু প্রশ্ন করিয়া উঠিল, ওই সিন্দুকটার ভেতর!

হ্যাঁ, তারপর নটিনী জাহাজে উঠে আমি তোমায় মুক্ত করে দোব।

কিন্তু তুমি জান না সুনন্দা, ওই সিন্দুকের ভেতর কপিঞ্জলকে আমি বন্দী করে রেখেছি।

হাসিটা করুণার কি বিদ্রুপের ঠিক বোঝা গেল না, সুনন্দা হাসিল। হাসিতে হাসিতেই কহিল, এত যে তোমার বুদ্ধি—কার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে বলছ ত? এখনও তুমি বুঝতে পারনি, কপিঞ্জল কে?

এক লহমার জন্য বিশু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, তুমিই কপিঞ্জল?

হ্যাঁ, আমিই। আমিই সাঙ্কো পাঞ্জার প্রধান অনুচর। আমিই ছদ্মবেশে বাবার সব কাজ করি এবং সেই জন্যেই তাঁর সব গুপ্ত কাহিনী

জানি। এখন এই জাহাজটার আরোহীদের যদি বাঁচাতে পারি, তাহলেই বুঝব আমার এতদিনকার অভিনয় সার্থক হয়ে উঠেছে।

চোখের জল আর বাধা না মানিয়া শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বরটাকে জড়াইয়া দিল। কোনমতে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে আবার কহিল, আর ঘণ্টাখানেকের ভেতর আমার কি ঘটবে কি জানি, কিন্তু তবু —তবু আমি মরতে চাই না।

মরতেই যে হবে কে বলল তোমাকে? বিশুর কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল সমবেদনার সুর।

সুনন্দা বলিল, মরা-বাঁচার কথা কেউ বলতে পারে কখনো?

বিশু বলিয়া উঠিল, অন্ততঃ আমি থাকতে যে নয়, এটা আমি শপথ-করেই বলতে পারি।

নিজের স্বার্থ আছে, তাই বলতে পারছি না, নৈলে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, তোমার স্পর্দ্ধা যেন চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে। যাক, এখন আমি যা বলি শোন।

বাইশ

নটিনী হইতে নির্ম্মম বিদ্রূপ-মাখা কণ্ঠে সাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় বলিয়া উঠিল, আর দশ মিনিট, যারা বাঁচতে চাও, আর দশ মিনিটের মধ্যে তারা নৌকোয় গিয়ে ওঠো। এই আমার শেষ সতর্কতা-বাণী। আর যারা এখনো ধনরত্নের মায়া কাটাতে পারনি, প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তারা জাহাজেই থাক, আমার আপত্তি নেই।

কথাগুলোকে রূপ দিবার অভিপ্রায়েই বোধ করি জলস্থল কাঁপাইয়া সাঙ্কো পাঞ্জার পিস্তল পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল, গুড়ুম, গুড়ুম....

বিশু কহিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও সুনন্দা, যা বলবার আছে তোমার। বড় জোর আর দশ পনেরো মিনিট....

সুনন্দাকে কিন্তু একটুও বিচলিত হইতে দেখা গেল না। ধীর শান্ত কণ্ঠেই সে কহিল, যা কিছু বলতে চাই তোমাকে, সবই তোমার সন্দেহ নিরসন করবার জন্যে। আমাকে ঘুণাক্ষরেও যদি সন্দেহ কর তুমি, মরেও আমি সুখ পাব না। একদিন তুমি বলেছিলে. আমার কিছুই তোমার কাছে অজানা নেই ; বাবাও বড়াই করেছিলেন, তাঁর চোখে ধুলো দিতে পারে এমন কেউ এখনো পর্য্যন্ত জন্মায়নি ; সেইজন্যে আমার এই কপিঞ্জল মূর্ত্তি। তোমার কথা ব্যর্থ করেছি, বাবার স্পর্দ্ধার মূলে কুঠার হেনেছি।

বিশু কহিল, কিন্তু তোমাকে ত কোনদিনই আমি সন্দেহ করিনি সুনন্দা। বুদ্ধিতে তুমি তোমার বাবার ওপরে গেছ, এ ত আমারই পরম গৌরব।

তুমি কি মনে কর, এই কপিঞ্জলের ভূমিকা অভিনয় করতে গিয়ে আমার মর্য্যাদা হারিয়েছি, না তোমার উপদেশ অগ্রাহ্য করেছি?

আমার উপদেশ!

হ্যাঁ। সত্যের জন্যে—ন্যায়ের জন্যে অবিরাম সংগ্রাম—তোমারই ত উপদেশ।

সত্যি বলতে সুনন্দা, তোমার কোন কথাই আজ আমি ভাল করে বুঝতে পারছি না। সবটাই যেন হেঁয়ালি। তবে এইটুকু বলতে পারি, কোন দিন—কোন অবস্থায় আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না।

তা আমি জানি, এবং জানি বলেই সেদিন তোমার সামনে কপিঞ্জল-বেশী আমি, অন্যান্য অনুচরদের মত সাঙ্কো পাঞ্জাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি নি। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলে, একমাত্র কপিঞ্জলই সেদিন সাঙ্কো পাঞ্জার কথার প্রতিবাদ করেছিল।

কিসের জন্যে সে প্রতিশ্রুতিটা, শুনতে পাই না সুনন্দা?

এই 'ঊর্ম্মি' জাহাজেই ডাকাতির প্রতিশ্রুতি।

অসহ্য বিস্ময়ে বিশু বলিয়া উঠিল, তাই নাকি!

হ্যাঁ। বাবা সেদিন যখন জানতে পারলেন, ধনরত্ন তাঁর সবই চুরি গেছে, খালি সিন্দুকটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলে তুমি, কি অপূর্ব্ব কৌশলেই না বিদ্রোহী অনুচরদের বশীভূত করে ফেললেন! কাছে তাঁর যা ছিল—সবই দিলেন ভাগ করে।

চোরের শাস্তির কি ব্যবস্থা হলো?

তুমি যখন বাবার গুলির আঘাতে মাটীতে পড়ে গেলে, মনে করলুম আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে; কিন্তু ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, সেদিন

তারা আমাকে কঠিন শাস্তি দিল না, তিন সপ্তাহের সময় দিয়ে বলল, যদি তার মধ্যে আমি সেই অপহৃত ধনরত্ন তাদের উদ্ধার করে দিতে না পারি, তাহলে—তাহলে....

তাকে শেষ করিতে না দিয়া বিশু কহিয়া উঠিল, ও বিপদের মধ্যে কেন তুমি মাথা গলাতে গেলে, সুনন্দা ?

কেন ? কর্ত্তব্যের আহ্বানে। কিন্তু এখন যাক্ ওসব কথা। যা বলবার আছে তোমাকে, শেষ করে নিই। সাঙ্কো পাঞ্জা এবং তাঁর অনুচরদের ঘৃণিত প্রবৃত্তির সামনে আমি মাথা পেতে দিয়েছি কেন জানো ? অন্ততঃ তিন সপ্তাহ তারা ধনরত্ন পুনরুদ্ধারের জন্যে অপেক্ষা করবে, তারপর করবে কপিঞ্জলের। কিন্তু কপিঞ্জলকে পাবে কোথায় ?

তোমার কার্য্যপ্রণালী দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্চি সুনন্দা। কার উপদেশে সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরদের কাছেও নিজেকে ঘৃণিত করে তুললে তুমি ?

নিজের বিবেকের চেয়ে বড় উপদেষ্টা আর কেউ নেই। সেই বিবেকই আমাকে একাজ করতে আদেশ দিয়েছে। তারপর শোন, যখন আমি ঊর্ম্মির ডাকাতির কথা জানতে পারলুম, তখনই বেরিয়ে পড়লুম—যদি পারি, সাঙ্কো পাঞ্জার এ অভিসন্ধি ব্যর্থ করতে। কিন্তু তুমি কি করে সন্ধান পেলে আমার ?

ঊর্ম্মির কথা আমি জানতুম। জানতুম অগাধ ধনৈশ্বর্য্য নিয়ে সাগরে সে পাড়ি দিচ্ছে। ভাবলুম হয়ত সাঙ্কো পাঞ্জা এই ধনরত্নেরই লোভে....

ঠিকই ভেবেছিলে তুমি। কিন্তু আমি যখন তোমায় দেখতে পেলুম ডেকের ওপর, প্রাণটা আমার সেই মুহূর্ত্তেই উড়ে গেছল! জানি ত,

প্রতুলবাবুকে আর তোমাকে বাবা কি ঘৃণাই না করেন। ঘুণাক্ষরেও যদি তিনি জানতে পারেন, এ জাহাজে তুমি আর....

ডুবিয়ে মারবেন, কেমন, এই ত ?

কিন্তু যে কোন রকমেই হোক্, আমাদের বাঁচাতে হবে।

আমাদের মানে ? আমাদের দু'জনের ?

না, এ জাহাজের সমস্ত যাত্রীর।

কিন্তু সেটা কি সম্ভব হবে সুনন্দা ?

কেন সম্ভব হবে না ? ইচ্ছাশক্তি যাঁদের প্রবল, কাজ করবার জন্যে যারা দৃঢ়সংকল্প, তাদের কাছে কিছু যে অসম্ভব নয়, তোমার মুখেই ত বহুবার শুনেছি।

অপূর্ব্ব একটা দীপ্তিতে সুনন্দার মুখ ভরিয়া উঠিল।

সে যে তারই কথা দিয়া তাকে বাঁধিতেছে, বুঝিতে বিশুর বাকী রহিল না। উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখে তাই সে বলিয়া উঠিল, বেশ, তা হলে বল কার্য্যপন্থা তুমি কি স্থির করেছ ?

সুনন্দার স্বরে প্রকাশ পাইল গর্ব্ব এবং আনন্দ। বলিল, নটিনীর নাড়ী-নক্ষত্রের খবর আমি জানি। তার একটা কামরায় খুব শক্তিশালী বেতার যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। তা দিয়ে আমরা সমুদ্রগামী কোন সরকারী জাহাজে খবর পাঠাব...

কি খবর পাঠাবে ?

তাঁদের সাহায্য চাইব। সাঙ্কো পাঞ্জা নটিনী জাহাজে আছে এবং সে ঊর্ম্মি লুঠ করতে চায় শুনলে নিশ্চয়ই তাঁরা আমাদের সহায়তা করতে ছুটে আসবেন। তার আগে কেবল আমাদের....

আমাদের মানে ?

মানে তোমার এবং আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে রাখতে চাই। আমি সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরদের জানাব, তাদের অপহৃত ধন-রত্ন উদ্ধার করেছি, এবং সেগুলো এই সিন্দুকে আছে। তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই সিন্দুকটা সযত্নে নটিনীতে নিয়ে গিয়ে তুলবে।

চমৎকার। আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বিশু বলিয়া উঠিল।

সত্যই সে সুনন্দার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরেরা ধনরত্নের লোভে তাকে নটিনীতে তুলিয়া লইয়া গেলে অতি সহজেই সে বেতার-ঘরে প্রবেশ করিতে পাইবে।

জয় যে এবার সুনিশ্চিত—কোন সন্দেহই বিশুর রহিল না। কোন প্রকারে একবার যদি সে সরকারী জাহাজে খবর পাঠাইতে পারে, তা হইলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসিয়া নটিনী আক্রমণ করিবে...

কি একটা ভাবিয়া হঠাৎ বিশুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। এই বেতারে বার্ত্তা পাঠানোর ভিতর কি যে বিপদ আছে, সুনন্দা কি একবারও ভাবিয়া দেখে নাই ?

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুনন্দা তার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, দেখ, আরো একটা কথা আছে। সরকারী জাহাজে খবর দিলেই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে উর্ম্মিকে ঘিরে ফেলবে, অনুচরদের গ্রেপ্তার করবে, বাবাকেও ত তখন তারা ছেড়ে দেবে না ? সেই জন্যে আমি ঠিক করেছি...

বিশু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

একটুখানি থামিয়া; জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুনন্দা বলিয়া চলিল, সেইজন্যে আমি ঠিক করেছি, যে মুহূর্ত্তে আমাদের এই সংবাদটা

পাঠানো শেষ হবে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোক এসে উর্ম্মি রক্ষার মনোযোগ দেবে, তারপরই আমরা আরো একটা বার্ত্তা পাঠাব, নটিনী কোথায় যাবে এবং কোথায় গেলে পাওয়া যাবে তাকে....

বিশুর মুখে ফটিয়া উঠিল বিচিত্র একটা হাসি। সুনন্দার অসমাপ্ত কথাটা শেষ করিল সে-ই। বলিল, শেষের এই যে সংবাদটা—নিশ্চয়ই মিথ্যা দিয়ে সৃষ্টি হবে, এবং পুলিশে নটিনীর কোন সংবাদই পাবে না, কেমন, এই ত ?

ঠিক তাই। সুনন্দাও ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

নির্নিমেষ চোখে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বিশু প্রশ্ন করিল, তারপর ? আমাদের অবস্থা ?

সুনন্দা হাসি দিয়া তার মনোভাব ঢাকিয়া কহিল, আমাদের বল না, বল আমার অর্থাৎ সুনন্দার। কারণ পুলিশকে তুমি কোনদিনই ভয় কর নি, যত ভয় তোমার সুনন্দার।

লজ্জা ঢাকিতে গিয়া বিশু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, বেশ, তাই না হল। কি ব্যবস্থাটা করেছ তোমার শুনি ?

দ্বিতীয় খবরটা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কাজ শেষ অর্থাৎ ছুটি। উর্ম্মিতে থাকা চলবে না, যে কোন রকমে একটা নৌকো যোগাড় করে তীরে উঠতে হবে।

বিশু বলিল, উর্ম্মি যাত্রীদের সাহায্যের জন্যে পুলিশ থেকে যে সব নৌকো আসবে, তারই একটায় উঠে....

কণ্ঠে সোহাগ মাখাইয়া সুনন্দা বলিয়া উঠিল, তাই। কিন্তু তোমার সাহায্য না পেলে কোনটাই আমি করতে পারব না, তা বলে রাখছি।

বিশুর দৃষ্টি তখন মেঝের উপর ন্যস্ত। গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। প্রথম দিকে সুনন্দার সহিত তার মতের কোন অনৈক্য নাই, কিন্তু শেষ দিক-টায়? তাতে কি রাজী হওয়া উচিত তার? সিন্দুকের ভিতর আবদ্ধ হইয়াই হোক, অথবা যে-কোন প্রকারেই হোক, নটিনীতে আরোহন করিয়া সরকারী কোন জাহাজে বেতারে সংবাদ প্রেরণ—এতে সে সর্ব্বান্তঃকরণেই সম্মত, কিন্তু সুনন্দার দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের মিথ্যা সংবাদ দিয়া সাঙ্কো পাঞ্জাকে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করা কি কর্ত্তব্য তার?

বিশুর মনের কথা সুনন্দার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিল, শুধু এই বারটার জন্যে বাবার জীবন তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি। আমার এই দুঃসাহসিকতার বিনিময়ে এই ভিক্ষাটুকুও দেবে না আমাকে?

তার কণ্ঠস্বর, বলার ভঙ্গী বিশুকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ভারী গলায় সে বলিয়া উঠিল, দোব, নিশ্চয়ই দোব সুনন্দা, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য...

কথাটা তার আর শেষ হইল না; সহসা বাহির হইতে শোনা গেল কতগুলা উত্তেজিত পদশব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস উন্মত্ত চীৎকার...

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে সুজাতা বলিয়া উঠিল, ওই—ওই তারা এসেছে, আর সময় নেই, তুমি এসো শিগগির....

সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরেরা সত্যই যে ঊর্ম্মির উপর আসিয়া পড়িয়াছে, বিশু নিঃসংশয়েই বুঝিতে পারিল; সিন্দুকটার দিকে যাইতে যাইতে কহিল, ভেতরে তো ঢুকব, কিন্তু বেরোব কি করে তার উপায়টা ত বলে দিলে না?

সিন্দুকটার নিকট অগ্রসর হইয়া সুনন্দা কহিল, এর ভেতরে একটা গুপ্ত কল আছে, এই দেখ। এটা দিয়ে যখন খুশি ভেতর থেকেই ওপরের ডালাটা তোলা যায়।

বেশ। আশা করি, এবার তারা এ ঘরে কপিঞ্জল ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবে না।

সুনন্দা এ কথার কোন জবাব না দিয়া মৃদু হাসিল।

সিন্দুকের ভিতর প্রবেশ করিয়া, আরামের সহিত যাতে শয়ন করা যাইতে পারে, বিশু সেই ব্যবস্থাই করিতেছিল।

সুনন্দা ডালাটা বন্ধ করিতে উদ্যত হইতেই সে বাধা দিয়া বলিল, দাঁড়াও সুনন্দা, আর একটা কথা…

কথার সুর শুনিয়াই সুনন্দা বুঝিয়াছিল, বিশু কি বলিতে চায়। জড়িত স্বরে সে কহিল, কি কথা বল।

এই জাহাজ থেকে যদি আমরা অক্ষত দেহে তীরে গিয়ে উঠতে পারি, তাহলে—তাহলে….

বিশু হঠাৎ থামিয়া গেল।

সুনন্দা প্রশ্ন করিল, তা হলে কি? তাড়াতাড়ি বল, চুপ করলে কেন আবার?

তাহলে কি আমরা….

সুনন্দা ঠিক এই ভয়টাই করিতেছিল। মুখখানা তার অকস্মাৎ রক্তহীন হইয়া উঠিল। নিজেকে কোনমতে সংবরণ করিয়া লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠেই সে কহিল, কি জানি, ভগবানের উদ্দেশ্য কি? তবে যতদূর আমার মনে হয়…

কি যে তার মনে হয়, শুনিবার জন্য বিশু উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

তবে যতদূর আমার মনে হয়, আমাদের মিলন বুঝি ভগবানের অভিপ্রেত নয়।

কেন ?

বাধা অনেক।

সে বাধা কি সরাতে পারি না আমি ?

না। সরালেও আমাদের মিলন হওয়া অসম্ভব।

সুনন্দার কথার অর্থ ধরিতে না পারিয়া বিশু অধীর কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, কি বলতে চাও তুমি ?

কি যে সে বলিতে চায়, বিশু আর শুনিতে পাইল না, সুনন্দা সহসা সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

সুনন্দার সহিত বিবাহ হইলেও সাঙ্কো পাঞ্জা যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন যে তাদের মিলন অসম্ভব—বিশু তা জানিত এবং জানিত বলিয়াই বাধাটা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল।

হঠাৎ বিশুর কানে আসিল দরজা খোলার শব্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যে কেবিনের ভিতর আসিয়া ঢুকিল, তাও সে বুঝিতে পারিল।

তারপরই সে শুনিল কপিঞ্জলের কণ্ঠ : ওহে, দু'জন তোমরা এদিকে এস দিকিন্।

একি! কপিঞ্জল! কে যেন বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল।

কপিঞ্জল তার কথার উত্তরে বলিল, কেন, আমাকে কি তোমরা চিনতে পারছ না ? এ ক'দিনে এমনিই বদলে গেছি আমি ?

লোকটি বলিল, না, না, তা নয়, আপনি এখানে এলেন কি করে ?

সে কথা পরে বলব, আপাততঃ দু'জন লোক চাই আমি।

কেন ?

কপিঞ্জল যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। কহিল, দু'জন লোক চাইছি, তারও কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

কিন্তু আপনার আদেশ করবার কোন ক্ষমতা আছে কি ?

কেন ?

বিশ্বাসঘাতক আপনি—চুরির ধনে বাটপাড়ি করেছেন।

সুনন্দা বিশ্বাসঘাতক! বিশুর সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। যদি তারা এই মুহূর্ত্তে বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করে ? পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া বিশু দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

সুনন্দা কহিল, বেশ, তাহলে আমাকে নিয়ে তোমরা যা ইচ্ছে করতে পার। কিন্তু তার আগে শোন, তোমাদের সঙ্গে আর তোমাদের মনিবের সঙ্গে কি সর্ত্ত আমার হয়েছিল। তিনি যদি শোনেন, অপহৃত ধনরত্ন উদ্ধার করা সত্ত্বেও কেবল দু'জন লোকের অভাবে তা [illegible] হয় নি, তখন তিনি কি ব্যবস্থা করবেন তোমাদের, তাও এর [illegible] দেখতে পার!

অপহৃত ধনরত্ন উদ্ধারের কথা শুনিয়া অনুচরদের আনন্দ, উৎসাহ এবং কৃতজ্ঞতার আর অন্ত রহিল না।

একজন বলিল, না, না, সত্যিই কি আপনার আদেশ অমান্য করতে পারি আমরা ? ও একটু পরক্ করে দেখছিলুম।

আর একজন বলিল, বলুন কি আদেশ, প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, আমরা এক্ষুনি পালন করব।

কপিঞ্জল কহিল, আমি তোমাদের মঙ্গলেচ্ছাই করি....

বাধা দিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুচরটি বলিয়া উঠিল, যেতে দিন, যেতে দিন, ও কথা তুলে আর আমাদের লজ্জা দেবেন না। আসল কথাটা কি জানেন? দশ পনেরো মিনিটের ভেতর জাহাজের কাজ আমাদের সেরে নিতে হবে, সাঙ্কো পাঞ্জার আদেশ। কাজেই....বলুন, কি করতে হবে আপনার।

সিন্দুকটার দিকে হস্তনির্দ্দেশ করিয়া কপিঞ্জল কহিল, নটিনীতে তুলতে হবে ওটাকে।

অপহৃত ধনরত্ন ওই সিন্দুকটার ভিতর আছে কল্পনা করিয়া লোকটা একগাল হাসিয়া কহিল, এক্ষুনি, এক্ষুনি—এর জন্যে আবার ভাবনা? কিন্তু আপনিও কি যাবেন এর সঙ্গে? না আমাদের সাহায্য করবেন একটু? বুঝতেই ত পারছেন, এত বড় জাহাজ—কোথায় কি আছে খুঁজে বার করা ত আর সহজ নয়?

তা ত নয়ই। চল, আমিও তোমাদের সাহায্য করছি। কপিঞ্জল তাদের সহিত অগ্রসর হইল।

তেইশ

সিন্দুকটা অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিতেই বিশু বুঝিতে পারিল, নটিনীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাকে।

সিন্দুকের ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া বিশু এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বাহিত হইয়াছে বহুবারই, কিন্তু এবারের অভিজ্ঞতাটা তার নূতন রকমের।

সিন্দুকটা বহন করা অনুচরদের কার্য্যতালিকাভুক্ত ছিল না। এটা তাদের অতিরিক্ত কাজ। সুতরাং তারা বিরক্ত হইয়াছিল যতটুকু, আনন্দিত হইয়াছিল ঠিক ততখানিই—এর ভিতর যা আছে, তার সমান অংশভাগী বলিয়া।

এই আনন্দ ও বিরক্তি এক সঙ্গে মিশিয়া তাদের মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল, সেটাই সিন্দুকটাকে অত্যধিক নাড়া দিতে-ছিল। একবার মাথার দিকে, একবার পায়ের দিকে দোল খাইতে খাইতে বিশুর দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। অথচ হেলিয়া পড়িয়া সে যে ভারের সমতা করিয়া লইবে, তারও উপায় নাই। নড়িলেই দুর্বৃত্তের দল বুঝিতে পারিবে, এর ভিতর অন্য যাই থাক, ধনরত্ন নাই। নিদারুণ যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া সে নিজের অস্তিত্বের কথা জানাইয়া দেয়, কিন্তু তাতেও প্রাণ-সংশয়। সুতরাং অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইল।

অবশেষে সিন্দুকটা একস্থানে নামাইয়া রাখিতেই বিশু বুঝিল, হয়ত এখানেই তার যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি।

বাহির হইতে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আনতে আর কিছু বাকী আছে নাকি হে?

উত্তরে কে যেন বলিল, না, এবারেই শেষ। সরে পড়বার ব্যবস্থা করতে পার।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। মানুষের পদশব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাইতেছিল না।

তারপরই কে যেন বিস্মিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কপিঞ্জল! কপিঞ্জলকে দেখা যাচ্চে না ওই নৌকোটায়?

আর একজন কে বলিল, হ্যাঁ, এদিকেই ত আসছে দেখছি।

এদিকে আসছে? কিন্তু আসছে কোন্ সাহসে?

ইতিমধ্যে নৌকাটা জাহাজের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল। লোকটার এ প্রশ্নের জবাব দিল কপিঞ্জলই স্বয়ং। বলি, যে সাহসেই আসুক, সে ভাবনায় তোমার কি দরকার? যে যার নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে।

অকুণ্ঠিত কণ্ঠে যেন বজ্রের গর্জ্জন।

কোন কথা বলিবে কি, লোকটা আর মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইল না, কোথায় অদৃশ্য হইল।

আবার স্তব্ধতা। সাগরের উচ্ছ্বসিত জলরাশিই শুধু গম্ভীর গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছিল।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কে বলিয়া উঠিল, তোমাদের নৌকোয় ও লোকটি কে হে?

বিশু শুনিল, চিনিল সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদেহ তার

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত দ্রুততর গতিতে বহিয়া গেল।

নৌকা হইতেই বোধ হয় কেহ উত্তর দিল, কপিঞ্জল।

কপিঞ্জল! অসহ্য বিস্ময়ে সাঙ্কো পাঞ্জা বলিয়া উঠিল, কপিঞ্জলকে তোমরা সঙ্গে নিয়ে আসছ কেন?

আমরা আনিনি, স্বেচ্ছায় আসছে ও।

সাঙ্কো পাঞ্জার কথার সুরে যেন কালবৈশাখীর বজ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল, স্বেচ্ছায় আসছে? কিন্তু আমার কি আদেশ ছিল?

উত্তরের প্রত্যাশায় মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় কহিল, আমার জাহাজে স্থান হবে না ওর। জলে ফেলে দাও, জলে ফেলে দাও....

কথাগুলা প্রচণ্ড বেগে গিয়া বিশুকে আঘাত করিল। মুখে তার ফুটিয়া উঠিল ঘৃণা, ক্রোধ ও হতাশার এক মিলিত অভিব্যক্তি। কিন্তু কিছুই করিবার উপায় ছিল না তার।

এবার কথা কহিল কপিঞ্জল। সাঙ্কো পাঞ্জার কথার উত্তরে সে বলিয়া উঠিল, জলে ফেলে দিতে চাও আমাকে? আমার জীবন কি এতই তুচ্ছ? কোন দাম নেই এর?

কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল, গর্ব্বিত পদশব্দ। কপিঞ্জল সাঙ্কো পাঞ্জার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তার মুখে চোখে সাঙ্কো পাঞ্জার মনে হইল, তার সর্ব্বাঙ্গে নির্ভীকতার একটা উগ্রতা ক্ষুরের ধারে নিষ্ঠুর হাসির মতই যেন বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে।

কপিঞ্জল দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল, হয়ত আসতুম না তোমার কাছে, কিন্তু তুমি জান, যে অপবাদ দিয়ে তোমরা আমায় তাড়িয়েছিলে ?

সাঙ্কো পাঞ্জা ভারী গলায় কহিল, কিন্তু সে অপবাদ কি দূর হয়েছে তোমার ?

হয়নি, তবে এবার হবে। যে সিন্দুকটা আমি সঙ্গে করে এনেছি, দেখেছ বোধ হয় ?

দেখেছি। কি আছে ওতে ?

তোমাদের সেই অপহৃত ধনরত্ন।

আমার অনুচরেরা তোমায় চিনতে পেরেছিল ?

হয়ত পেরেছিল। কিন্তু তার আগেই আমি তাদের কাছে পরিচয় দিয়েছিলুম।

কেন ?

যদি না চিনতে পারে।

সিন্দুকটা এ জাহাজে আনতে তুমিই ওদের আদেশ করেছিলে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা ? পাছে জাহাজ ডোবার সঙ্গে তুমিও ডুবে মর, এই ভয়ে, না ?

তাই কি তোমার বিশ্বাস, সাঙ্কো পাঞ্জা ? তাহলে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, তুমিই বল ত, তোমার সামনে এসে বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ানো আর জাহাজের কেবিনে বসে নিরুদ্বেগে ডুবে মরা—এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশি ভয়াবহ ?

আনন্দে—উত্তেজনায় বিশুর বুকের ভিতর দুপ্‌ দুপ্‌ করিয়া উঠিল।

সুনন্দার কি বুদ্ধি! কথা বলার চাতুর্য্য কি চমৎকার! সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল, সাঙ্কো পাঞ্জার উত্তরের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু কপিঞ্জলের কথার উত্তরে সাঙ্কো পাঞ্জা কিছুই বলিল না; হয়ত কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাই সে প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া উঠিল, বেশ, তোমার নৌকো ততক্ষণ জাহাজে এসে উঠুক, তুমি আমার কেবিনে এস।

তোমার কেবিনে? এখনও কি সেখানে স্থান আছে আমার?

আছে, তুমি এস।

কিন্তু যাবার আগে আমি সিন্দুকটার একটা সুব্যবস্থা করে যেতে চাই।

দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই, আমার অনুচরেরাই ওটার সুব্যবস্থা করতে পারবে।

ওদের সুব্যবস্থা মানে? হয়ত ধনরত্নগুলো আত্মসাৎই করে বসবে। না, না, আমি নিজেই ওর একটা ব্যবস্থা করব।

সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিল বিরক্তির সুর; কহিল, তাহলে কি তুমি চাও আমার সামনেই আমার অনুচরদের আদেশ করতে?

কেন করব না? যদি প্রকৃতই আমি অপরাধী হতুম, তাহলে তুমি কি আমাকে এতদিন হত্যা না করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে সাঙ্কো পাঞ্জা? তা যখন করনি, আমি জানি আমার প্রতিটী কথায় এবং কাজে তোমার পূর্ণ সম্মতি আছে।

তার মানে? তুমি যদি তোমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে কতগুলো আজগুবি গল্পের সৃষ্টি কর, তাও বিনা প্রতিবাদে আমায় শুনে যেতে হবে?

কপিঞ্জল শিশুর মতই হাসিয়া উঠিয়া কহিল, তা যদি শোন সাঙ্কো পাঞ্জা, তাহলে এমন অনেক গল্পই তোমার কাছে করতে পারি, যা শুনে আনন্দই পাবে তুমি।

বিশু অবাক্ হইয়া গেল। সাঙ্কো পাঞ্জার প্রকৃতি তার অজ্ঞাত নয়। দুর্দ্দমনীয় প্রভুত্বের অহঙ্কারে পরিপূর্ণ সে, কেহ কোন প্রতিবাদ করিলে বা কোন কাজে বাধা পাইলে পশুর মতই হিংস্র হইয়া উঠে। কিন্তু আজ? কণ্ঠে তার এতটুকু উষ্মা না ....

চিন্তাসূত্র তার ছিন্ন হইল সাঙ্কো পাঞ্জার কথায়। কপিঞ্জলকে সে বলিল, আচ্ছা, আজকের মত কোন কাজেই আমি বাধা দেবো না তোমাকে।

কপিঞ্জলেরই আদেশে সিন্দুকটা নৌকা হইতে জাহাজে তোলা হইল।

সাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় কহিল, আশা করি, এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ. কপিঞ্জল? সিন্দুকটা তোমার সম্পূর্ণ নিরাপদ;

কপিঞ্জল বলিল, হ্যাঁ, আর আমার কিছু বলবার নেই।

তাহলে এবার তুমি কেবিনে আসিতে পার।

না।

এখনও যেতে অস্বীকার করছ কেন?

আমার বলার আগেই সেটা তোমার বোঝা উচিত ছিল, সাঙ্কো

আমার কি উচিত অনুচিত, তুমি আমাকে শেখাতে এস না কপিঞ্জল! তোমার কথা, তোমার হাবভাব আজ আমার মনে সন্দেহই জাগাচ্চে!

কিন্তু এখানেই তুমি ভুল করছ সাঙ্কো পাঞ্জা!

অত্যুত্তপ্ত খইয়ের মত ছিটকাইয়া উঠিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা কহিল, ভুল করছি! আমি! বাঃ, বাঃ, তুমি দেখছি অনেক কিছুরই অভিযোগ আনছ আমার বিরুদ্ধে!

অভিযোগ নয়, কোন কিছু মত প্রকাশ করার আগে আমার বলার যা আছে, শুনে নিলে ভাল হয় না?

সব কথাই ত তুমি আমাকে বলেছ?

না। আসল বক্তব্যটা আমার এখনো বলা হয় নি। তোমার সমস্ত অনুচরদের সামনে তুমি আমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনেছিলে। বলেছিলে, যে ধনরত্ন তুমি পরস্পর বিভাগ করে নেওয়ার জন্যে মাটীর নিচে পুঁতে রেখেছিলে, তা নাকি আমি চুরি করেছি। মনে আছে?

মনে না থাকার কিছুই নেই এতে। যা সত্যি, আমি তাই বলেছি।

কিন্তু সত্যটা তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। চুরি করা দূরে থাক, পুলিশের হাতে পড়বার আগে আমি ওর অস্তিত্বও জানতুম না।

সাঙ্কো পাঞ্জা বলিল, মিথ্যা কথা।

কপিঞ্জল দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, মিথ্যা যে নয়, আমি তার প্রমাণ দেব।

এই কি তোমার আসল বক্তব্য?

না। তুমি যখন অভিযোগ এনেছিলে, তখন সকলেই উপস্থিত ছিল সেখানে। এখন কি আমি দাবী করতে পারি না যে, সেই সব লোকের সামনেই আমার অভিযোগের বিচার হোক?

এই তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ, এই শেষ কথা।

আমি যদি গোপনে এই অভিযোগের মীমাংসা করি?

প্রয়োজন নেই। একদিন যা দশজনের সামনে প্রচার করেছ, দশ জনের সামনেই তা প্রত্যাহার করে নাও, এই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

বেশ, তোমার ইচ্ছা-অনুযায়ী কাজই হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো কপিঞ্জল, তুমি যখন সকলের সামনেই বিচার প্রার্থনা করেছ, তখন বিচারের ফলটাও তোমাকে সকলের সামনে গ্রহণ করতে হবে।

কোন আপত্তি নেই আমার।

অভিযোগে যদি সত্য প্রমাণিত হয়, হয়ত এমন শাস্তিও হতে পারে, এই জাহাজটারই মাস্তুলের সঙ্গে তোমায় আমি বেঁধে রাখব বুঝতে পেরেছ আমার কথা?

পেরেছি।

তাতে সম্মত আছ?

সাঙ্কো পাঞ্জার প্রত্যেকটি কথা বিশু মন দিয়া শুনিল: শুনিয়া বুকের স্পন্দনটুকুও বুঝি তার গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। একি সম্ভব? সাঙ্কো পাঞ্জা তার একজন অনুচরের সহিত কথা কহিতেছে—কণ্ঠস্বরে অবজ্ঞা নাই, ঘৃণা নাই, ক্রোধ নাই। সহসা একটা কথা বিদ্যুৎ-বিকাশের মতই বিশুর মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। সাঙ্কো পাঞ্জা ছদ্মবেশী কপিঞ্জলকে সুনন্দা বলিয়া চিনিতে পারে নাই ত?

মন বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই পারিয়াছে। তাই সে চাহিতেছিল নিজের কেবিনে লইয়া গিয়া নির্জ্জনে কথা কহিতে।

আর সুনন্দা? বুদ্ধিমতী সে, সাঙ্কো পাঞ্জার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই হয়ত তাকে এড়াইতে চাহিতেছে। কিন্তু..

বিশুর বুকের ভিতর রক্তস্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল। অভিযোগ যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়? সুনন্দা নিশ্চয়ই আত্মপরিচয় দিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিবে না, আর নির্ম্মম দস্যু সাঙ্কো পাঞ্জাও কন্যা বলিয়া তাকে এতটুকু করুণা দেখাইবে না।

দুর্ভাগিনী সুনন্দার ভাগ্যের ছবিটা বিশুর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন অতি করুণভাবেই ভাসিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তা আসিয়া আবার তার মন অধিকার করিল। সাঙ্কো পাঞ্জা সত্যই যদি সুনন্দাকে চিনিতে পারিয়া থাকে, তা হইলে সুনন্দার মুখে যতটুকু সে শুনিয়াছে এবং সাঙ্কো পাঞ্জার ব্যবহারে যতদূর মনে হয়, তাকে সে প্রাণের মতই ভালবাসে। সে ভালবাসা উপেক্ষা করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা কি তার মৃত্যুদণ্ড উচ্চারণ করিতে পারিবে?

বিশুর মাথার ভিতর যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। সে শুধু একটা দিকই বা ভাবিতেছে কেন? সাঙ্কো পাঞ্জা যদি সুনন্দাকে না চিনিয়া থাকে? তা হইলে কর্ত্তব্য কি তার?

প্রথমতঃ সিন্দুক হইতে মুক্তিলাভ। সেটা সহজসাধ্য, সুতরাং তা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ সুনন্দাকে সঙ্গে লইয়া বেতার-ঘরে প্রবেশ। আপাততঃ সেটা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিশ্চয়ই সুনন্দার উপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ উর্ম্মিকে সাঙ্কো পাঞ্জার কবল হইতে মুক্ত করা; তাতেও সম্প্রতি বাধা-বিপত্তি অনেক। মোটের উপর দাঁড়াইল এই—যে কার্য্যতালিকা

তারা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তার একটিও এখন কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব।

অথচ এরূপ অবস্থায় হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতেও বিশু পারে না। পুরাতন কার্য্য-তালিকার কথা ভুলিয়া গিয়া কোন নূতন পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টায় সে তখন আত্মনিয়োগ করিল।

কি একটা মনে হইতেই তাড়াতাড়ি সে পকেটের ভিতর হাত দিয়া দেখিল, ছুরিটা আছে কিনা।

ছুরিটা পাইতেই সে কুরিয়া কুরিয়া, সিন্দুকের গায়ে একটা গর্ত্ত করিতে সুরু করিল। ক্ষুদ্র একটা গর্ত্ত—কোন রকমে পিস্তলের মুখটা যাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। তা হইলেই সিন্দুকের প্রহরায় নিযুক্ত প্রহরী-দের সে অনায়াসে হত্যা করিয়া বাহিরে আসিবে, এবং নির্ব্বিঘ্নে একবার বাহিরে আসিতে পারিলেই সুনন্দার সাহায্যে অগ্রসর হইবে।

কিন্তু যদি কেহ কাঠে গর্ত্ত করিবার শব্দ শুনিতে পায়? বিশু ভাবিল, যদিই বা শুনিতে পায়, ইঁদুরের কীর্ত্তি বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। জাহাজে ইঁদুরের অভাব নাই।

নিবিষ্ট মনেই সে গর্ত্ত করিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ শোনা গেল অতি নিকটেই পদশব্দ। হাতের কাজটা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া বিশু কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, কাটার শব্দেই আকৃষ্ট হইয়া কেহ আসিতেছে না অন্য কোন কাজে?

পদশব্দ ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইল। অবশেষে বিশুই স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, কে একজন তার সিন্দুকের উপর আসিয়া উপবেশন করিল। কে সে?

বিশু ভাবিল, সিন্দুকের প্রহরায় নিযুক্ত আছে যে প্রাণীটি, সেই হয়ত আর দাঁড়াইতে না পারিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া লইতেছে, অথবা··

সুনন্দার প্রহরীও হইতে পারে ত?

ভয় করিবার মত কিছুই দেখিতে না পাইয়া বিশু আবার তার কাজে মন দিল, কিন্তু এবার অতি ধীরে—অতি সন্তর্পিত হস্তে।

কিছুক্ষণ পরেই ছোট একটি গর্ত্তের সৃষ্টি হইল। আনন্দে—আগ্রহে বিশু তার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বাহিরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই নিজের ভুল বুঝিতে বিশুর বিলম্ব হইল না। সাঙ্কো পাঞ্জা সুনন্দাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারে নাই, চিনিলে কখন সে এতদূর নির্ম্মম হইতে পারিত না।

বিশু দেখিল, জাহাজের বড় মাস্তুলটার সহিত মোটা কাছি দিয়া কপিঞ্জলকে বাঁধা হইয়াছে! একটু নড়িবার শক্তিও তার নাই।

বুক ঠেলিয়া বিশুর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে ভাবিতে লাগিল, তবু—তবু কি সুনন্দা তার নিজের পরিচয় দিবে না?

নিজের পরিচয় না দিতে চাক, সে ত এখনই বলিতে পারে, সিন্দুক-টার ভিতর ধনরত্ন নাই, বিশুকে সুকৌশলে সে বন্দী করিয়া আনিয়াছে, তা হইলে সাঙ্কো পাঞ্জা নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করিবে, অনুচরেরা তার সুনন্দার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিবে।

অন্য দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই বিশু দেখিতে পাইল, চারিদিকে কর্ম্মব্যস্ততা; খালাসীর দল ছুটাছুটি করিয়া উর্ম্মি হইতে লুণ্ঠিত জিনিষ-পত্রের গোছগাছ করিতেছে। জাহাজ ছাড়িবার [illegible]

ঠিক এমনি সময় বিশু বুঝিতে পারিল, তার সিন্দুকের উপর উপবিষ্ট প্রাণীটা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে পথ দিয়া এবার চলিল সে, গর্ত হইতে দেখা যায়। বিশু লক্ষ্য করিল, কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই লোকটা জাহাজের উপর পতিত কতগুলা পার্শ্বেলের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। তারপরই সজোর একটা পদাঘাত—পার্শ্বেলের এক পাশ খসিয়া পড়িতেই সে তার ভিতরের জিনিষগুলার একটা ধারণা করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল।

এই উপযুক্ত অবসর। বিশু পিস্তলটাকে গর্ত্তের নিকট ধরিয়া তার আয়তন সম্বন্ধে একটা অনুমান করিয়া লইল। গর্ত্তটা ছোটই হইয়াছে, বিশু আবার তার ভিতরে ছুরি ঘুরাইতে লাগিল।

গর্ত্তটা আরও বড় হইলে বিশু দেখিতে পাইত, হাত কয়েক দূরে আরও একজন আরোহী তারই মত নিবিষ্ট চিত্তে পিস্তলটা পরীক্ষা করিতেছে।

চমৎকার! আরোহীদের অস্ফুট কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যদিও পকেটে করে নিয়ে যাবার পক্ষে একটু বড় এটা' তাহলেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান সহায়ক। দশটা গুলি ধরতে পারে এতে, কাজেই যে ক'টা আমার দরকার, তার চেয়ে বেশীই ধরে। এদের সবগুলোকে ব্যবহার করবার মত সময় এবং সুবিধে হয় ত পাব না আমি....আচ্ছা, দেখাই যাক না গুণে—মোট ক'টা আমার দরকার?

প্রথম গুলিটা সাঙ্কো পাঞ্জার জন্যে। জীবিত অবস্থায় ধরতে পারলে প্রতিশোধটা নেওয়া হতো ভালই, কিন্তু তার ত কোন উপায় দেখছি না। কাজেই প্রথম গুলিটাতে হত্যা করতে হবে তাকেই।... করলেই বা

হত্যা ? দেশ বাঁচবে তার নির্মমতার হাত থেকে, আমরা বাঁচব মুক্তির স্বাদ ফেলে।

দ্বিতীয় গুলিটা নিক্ষেপ করা যাবে কপিঞ্জলের ওপর। গাঙ্কো পাঙ্কার সঙ্গেও যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, নিশ্চয়ই সে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নয়।

তৃতীয় গুলিটা দাবী করতে পারে একমাত্র উল্লাস। সর্পের মত ক্রূর সে, হিংস্র পশুর মতই ভয়ঙ্কর। গাঙ্কো পাঙ্কার প্রতিটী কাজেই সে তার পরম সহায়।

চতুর্থটা ? এটা বিঁধবে গিয়ে শ্যাম সর্দ্দারের বুকে! শুনেছি গুলি ছোড়ায় সে সিদ্ধহস্ত। দেখতে হবে আমার গুলিও যেন কোনরকমে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

পঞ্চমটা ? এটা—এটা কার প্রাপ্য ? ..

এইরূপে প্রতিটী গুলিই কার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে, স্থির করিয়া আরোহীটি পরম নিশ্চিন্ত মনে পিস্তলটা পকেটের ভিতর কোনমতে লুকাইয়া রাখিল।

সত্যই বিশুর বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না যদি সে জানিত, আরোহীটা আর কেহই নয়—স্বয়ং প্রতুল লাহিড়ী।

চব্বিশ

গাড়ীখানা প্রতুলের আদেশমতই পূর্ণবেগে ছুটিতে ছুটিতে অনতিবিলম্বে ঘন বৃক্ষসমাচ্ছন্ন একটা প্রশস্ত বর্ত্মে আসিয়া পড়িল। গাড়ীটা একবার থামাইতে বলিয়া, প্রতুল লোকটির দিকে তাকাইয়া কহিল, ফেলো দিকিন্ তোমার কাপড় জামাটা খুলে।

লজ্জায় লোকটির মুখখানা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। আমতা আমতা করিয়া কহিল, ছেলেমানুষ্ পেয়ে আমার সঙ্গে আপনি রসিকতা করছেন প্রতুলবাবু?

মোটেই না। ভয় নেই, আমার জামা-কাপড়গুলো দোব তোমাকে, তার বদলে....

অসহ্য বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া লোকটা বলিয়া উঠিল, তার মানে আপনি কি....

ঠিক তাই! দাও তাড়াতাড়ি।

ক্ষিপ্রহস্তে লোকটার দেহ হইতে জামা-কাপড় খুলিয়া লইয়া প্রতুল পরিল এবং তার কাপড়-জামা দিল লোকটাকে পরাইয়া। ড্রাইভারকে কহিল, এবার সোজা একেবারে জাহাজ-ঘাটে...

লোকটা রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছিল। বিবর্ণমুখে ঢোক গিলিতে গিলিতে কহিল, তবে যে বললেন, মুক্তি দেবেন আমাকে?

প্রতুল হাসিয়া জবাব দিল, মুক্তি ত দিলুমই। আজ থেকে তুমি হলে প্রতুল লাহিড়ী, আর আমি....হ্যাঁ, তোমার নামটা কি?

আজ্ঞে, ননীগোপাল।

সাঙ্কো পাঞ্জার দলে যোগ দিয়েছ কতদিন?

আজ্ঞে, ঠিক যোগ দিইনি....

তবে?

মাঝে মাঝে তাঁর ফাই-ফরমাসটা খাটি, দু'চারটে টাকা পারিশ্রমিক দেন, ব্যস্, এই পর্য্যন্ত।

সাঙ্কো পাঞ্জাকে দেখেছ কোনদিন? চেনো তাকে?

সত্যি কথা বলতে কি....আমার বড় জল তেষ্টা পেয়েছে প্রতুলবাবু।

প্রতুল কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বলে আমাকে ভোলা-চেষ্টা ক'র না, ননীগোপাল।

ননীগোপাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে, দেখেছি। কিন্তু কি দেখেছি জানেন? শুধু কালো একটা আলখাল্লা...

কথাটায় অবিশ্বাসের কিছুই ছিল না। প্রতুল জানিত, সাঙ্কো পাঞ্জার স্বরূপ হয়ত কেহই কোনদিন দেখে নাই। পুনরায় সে জিজ্ঞাসা করিল, সুজাতা দেবীকে দেখেছ কোনদিন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকদিনই দেখেছি। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু....

প্রতুল যখন জাহাজ-ঘাটে আসিয়া অবতরণ করিল, সুজাতা তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। ড্রাইভারের কাছে গিয়া সে নিম্ন কণ্ঠে কহিল, প্রতুল লাহিড়ীকে নিয়ে তুমি একটা হোটেলে গিয়ে উঠবে, গোকুল। যতদিন না আমি ফিরি, সর্ব্বদাই কড়া পাহারায় রাখবে, এক মিনিটের জন্যেও যেন চোখের আড়াল না হয়। দিন পনেরো অপেক্ষা ক'র, তার পরও যদি না ফিরি, ছেড়ে দিও ওকে।

ক্ষুধায় শরীরটা তার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সামনের একটা হোটেলে ঢুকিয়া, কিছু খাইয়া লইয়া নটিনীতে সে উঠিয়া বসিল। ননী-গোপালের ছদ্মবেশে কোনংঅসুবিধাই ভোগ করিতে হইল না তাকে।

কিছুক্ষণ পরে সুজাতাও আসিয়া নটিনীতে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে একটা উদ্দীপনা দেখা গেল। এবার বোধ করি জাহাজ ছাড়িবে। কর্ম্মচারীগুলা যে তাদের এই সম্মানীয় যাত্রীটীর জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল, বুঝিতে প্রতুলের বাকী রহিল না।

কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা কোথায়? এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রতুল ডেকের উপর অগ্রসর হইতে লাগিল।

অনতিদূরেই সুজাতার কেবিন। মুখ তুলিয়া সেদিকে তাকাইতেই প্রতুলের উদ্যত চরণ অকস্মাৎ অচল হইয়া গেল। কেবিনের দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুজাতা প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহিত কথা কহিতেছে।

কিন্তু কে এই ক্যাপ্টেন? অভিনব ছদ্মবেশ হইলেও সাঙ্কো পাঞ্জাকে চিনিতে প্রতুলের কোন কষ্টই হইল না।

যথা সময়েই জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সারাদিন আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ঘটে নাই। তারপর নিশীথ রাত্রে এই নটিনী আক্রমণ।

প্রতুল স্বচক্ষেই দেখিল, সাঙ্কো পাঞ্জার এই অমানুষিক অত্যাচার। তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তাই সে স্থির করিল, প্রথম গুলিটাতেই সাঙ্কো পাঞ্জাকে হত্যা করিয়া দেশকে তার অত্যাচারের কবল হইতে মুক্ত করিবে।

কিন্তু পকেটের ভিতর পিস্তলটা রাখিয়াই সে তার মত পরিবর্ত্তন

করিল। শুধু সাঙ্কো পাঞ্জা বা তার দু'একজন অনুচরকে হত্যা করিয়াই বা কি লাভ? যদি পারে, সমগ্র দলটাকেই সে আজ বন্দী করিবে।

ঊর্মি হইতে অধিকাংশ আরোহীই নামিয়া গিয়া তীরে দাঁড়াইয়াছিল। কারও পালাইবার উপায় ছিল না; উদ্যত পিস্তল হস্তে যমদূতের মত কয়েকজন অনুচর তাদের পাহারা দিতেছিল। জাহাজে ছিল শুধু তারাই, তুচ্ছ প্রাণের মমতায় যারা ধনরত্নের মায়া কাটাইতে পারে নাই, এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দল। লোহার শৃঙ্খলে সকলেই তারা বন্দী।

লুণ্ঠন শেষ হইতেই সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচরেরা উৎসাহে, আনন্দে বীভৎস চীৎকার করিতে করিতে নটিনীতে আসিয়া উঠিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাইয়া কহিল, সব শেষ?

উল্লসিত কণ্ঠে একজন জবাব দিল, সব শেষ।

তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন বলিয়া উঠিল, কি মজাই যে হবে সর্দ্দার!

আর একজন বলিল, কোথায় লাগে কালীপূজোর বাজী! বোমাগুলো যখন ফুটতে সুরু করবে....

সাঙ্কো পাঞ্জা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। অকস্মাৎ কেন যে তার এই ভাব-বৈলক্ষণ্য, কেহই বুঝিল না।

এমনি সময় ভিড় ঠেলিয়া সাঙ্কো পাঞ্জার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল উল্লাস। মুখে যেন উল্লাস ধরে না।

সাঙ্কো পাঞ্জা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, কি খবর?

উল্লাস জবাব দিল, খবর সব দিক থেকেই শুভ, সর্দ্দার।

জাহাজের অবস্থা?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জলমগ্ন হবে।

মালপত্র?

ধনরত্ন সব তোমার ওই সিন্দুকে, আর বাকী যা কিছু সব জাহাজের খোলে।

যাত্রীরা?

যারা প্রাণ চেয়েছিল, তাদের তীরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কাউকে চোখের আড়ালে যেতে দেওয়া হয় নি। আমাদের জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারাও ছাড় পাবে।

কর্ম্মচারীরা?

প্রাণ চায় না তারা।

একজনও কেউ বেঁচে পালাতে পারবে না?

না।

নিঃসন্দেহ?

নিঃসন্দেহ। পালাবার উপায় একমাত্র নৌকো, প্রত্যেকটিই তার ফুটো করে দিয়েছি। বিস্ফোরণের পর একটার পর একটা জলে ডুববে।

তাহলে ও-জাহাজটার কথা আমরা একেবারেই ভুলে যেতে পারি বল?

হ্যাঁ, উর্ম্মির চিহ্নও আর কেউ খুঁজে পাবে না।

দুর্বৃত্ত প্রভু ভৃত্যের এই কথোপকথন শুনিয়া প্রতুলের দুই চোখ

আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পকেট হইতে 'ওয়্যারলেস'টা বাহির করিয়া কি করিল সে-ই জানে। মনে মনে কহিল, 'জলবালা' এসে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেকও লাগবে না, কাজেই ঊর্ম্মির ব্যবস্থা আনন্দ-বাবুই করতে পারবেন, কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জার····

চিন্তাসূত্র তার ছিন্ন হইল সাঙ্কো পাঞ্জার কণ্ঠস্বরে। পুনরায় সে কহিয়া উঠিল, যে ধনরত্ন আমরা লুণ্ঠন করেছি, এতে সবারই সমান অধিকার। আমার ইচ্ছে, এগুলো আমরা এখনই সমান ভাগে ভাগ করে নিই।

অনুচরেরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, এখন কেন সর্দ্দার ?

সাঙ্কো পাঞ্জা ইঙ্গিতে তাদের চুপ করিতে বলিয়া কহিল, আগে বক্তব্যটা আমার শেষ করতে দাও, তারপর প্রতিবাদ কর তোমরা। লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে কোন দিনই কি আমি তোমাদের কাছে এরকম প্রস্তাব উত্থাপন করেছি ? কোনদিনই না। কিন্তু আজ করছি কেন জান ? সমুদ্রে সরকারী জাহাজের অভাব নেই। কোন রকমে যদি তারা একবার ঊর্ম্মির এই দুর্গতির খবর পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এসে নটিনীকে আটক করবে। তোমরা কি বলতে চাও, সকলে মিলে আমরা একই সঙ্গে ফাঁসী কাঠে ঝুলব ?

জনতার মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। এবার আর প্রতিবাদের নয়, ভবিষ্যতের ভয়াবহ কল্পনার।

সাঙ্কো পাঞ্জা বলিয়া চলিল, পুলিশের হাতে যদি মৃত্যুকে বরণ করে না নিতে চাও, তাহলে এস, আগে থেকেই আমরা সাবধান হই।

উল্লাস কহিল, কিন্তু আমি কি একটা প্রস্তাব করতে পারি, সর্দ্দার ?

স্বচ্ছন্দে।

আমি বলি, আমাদের লুণ্ঠিত সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে উড়ো জাহাজটায় চড়ে আপনি চলে যান, আমরা জাহাজেই যাচ্ছি।

সকলেই উল্লাসের প্রস্তাবে সমর্থন করিল। কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কোন সরকারী জাহাজ যদি এসে পড়ে?

উল্লাস সগর্ব্বে জবাব দিল, সাঙ্কো পাঞ্জার অনুচর আমরা, পুলিশকে কোনদিনই ভয় করিনি, আজও করব না।

তার কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিয়া উঠিল—তাচ্ছিল্যের হাসি। ভয়ে—আতঙ্কে সাগর-জলও যেন কাঁপিয়া উঠিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা কহিল, বেশ, তাই হোক। তোমরা তাহলে লুণ্ঠিত ধনরত্নের সিন্দুকটা উড়ো জাহাজেই ভরে দিয়ে এসো। পাইলট? কে যাবে আমার সঙ্গে?

অনুচরদের দিকে চাহিয়া সোৎসুক নেত্রে উল্লাস বলিয়া উঠিল, কে যেতে চাও সর্দ্দারের সঙ্গে?

ছদ্মবেশী প্রতুলের মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু—কিন্তু ননী-গোপাল কি জানে উড়ো জাহাজ চালাইতে?

তার এ সমস্যার ভঞ্জন করিল শ্যাম সর্দ্দার। কহিল, তুমিই যাও না হে ননী, সর্দ্দারের সঙ্গে।

ননীগোপালের কোন আপত্তিই নাই। ধীরে ধীরে সে সাঙ্কো পাঞ্জার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা কহিল, সিন্দুকটা দিয়ে এলেই তুমি তৈরী থেকো গোপাল, আমি যাব আর জাহাজ ছাড়বে। যাও।.. হ্যাঁ, আর একটা কথা। যদি দেখো তোমরা, সরকারী জাহাজ সত্যিই এসে পড়েছে,

তাহলে যে ক'জন পার, আর একটা যে উড়োজাহাজ আছে, তাতে উঠে পড়ো, আর বাকী সব নৌকোয়।

শ্যাম সর্দ্দার বলিয়া উঠিল, সে কথা আমাদের বলে দিতে হবে না সর্দ্দার। এতদিন কি মিছেই তোমার সাকরেদী করেছি?

কয়েকজন ধরাধরি করিয়া ধনরত্ন ভরা সিন্দুকটা উড়ো জাহাজে রাখিতে চলিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা পুনরায় কহিল, যাবার আগে কপিঞ্জলের ভার আমি তোমাদের হাতেই দিয়ে গেলুম। একদিন ও ছিল আমার প্রধান অনুচর আর তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু।

কিন্তু আমি কি কোনদিন সে মর্য্যাদার হানি করেছি? কপিঞ্জল গর্জ্জিয়া উঠিল, তার বিনিময়ে তোমরা আমাকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধেছ, আর কি কঠোর শাস্তি দিতে পার, তার জল্পনা-কল্পনা করছ। কোন অপরাধই আমার নেই...

তাকে শেষ করিতে না দিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা কহিয়া উঠিল, অপরাধ নেই তোমার? আমাদের সবাইকে ঠকিয়ে তুমি ধনরত্ন চুরি করেছিলে।

কপিঞ্জল বলিল, তাহলে আবার ধরা দিতে আসব কেন?

সাঙ্কো পাঞ্জা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; কহিল, আমার কাছে ধরা দিতে এসেছিলে, না দৈবক্রমে উর্ম্মির যাত্রী হয়ে বসেছিলে? অনুচরদের হাতে ধরা পড়বার পর কোন উপায় না দেখে....

কপিঞ্জলের চোখ দু'টা ধবক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—সে কহিল, তাহলে.... কিন্তু সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না। ধনরত্ন-ভরা সিন্দুকটার কথা উল্লেখ করিলেই হয়ত এখনি সাঙ্কো পাঞ্জা দেখিতে চাহিবে এবং তার

পরিণাম যে কি, ভাবিতেই সুনন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, বুকের রক্ত জমাট বাঁধিয়া গেল। . . .

বিনা প্রতিবাদে সাঙ্কো পাঞ্জার এই অপবাদ তাকে মাথা পাতিয়া লইতে দেখিয়া অনুচরের দল প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করিল, সত্যি বল তোমার উদ্দেশ্য কি, নৈলে...

বাধা দিয়া কপিঞ্জল কহিল, "নৈলে যে কি করবে, না বললেও চলে। সত্যি যদি আমি তোমাদের ধনরত্ন চুরি করে থাকি, তাহলে তার পিছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাধা দেওয়া....

কপিঞ্জলের এই গর্ব্বিত আস্ফালনে অনুচরেরা যে কি করিয়া বসিত বলা যায় না, কিন্তু বাধা আসিল অপ্রত্যাশিত ভাবে।

পর-পর কয়টা বিস্ফোরণের শব্দ; তারপর মুহূর্ত্তেই গভীর কালো ধোঁয়ায় নটিনীর ভিতর-বাহির যেন ঘোর অমানিশার অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কপিঞ্জলের কানে কানে কে যেন বলিয়া উঠিল, কোন ভয় নেই সুনন্দা, আমরা পালাই এস।

পঁচিশ

ডেকের উপর পতিত পার্শেলগুলার একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া লোকটী চলিয়া যাইতেই, তার ভিতরের বস্তুটা বিশুরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিপদের সময় যাত্রীদের সাবধান করিবার জন্য জাহাজে এক শ্রেণীর বিস্ফোরণকারী বোমা ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র বিকট একটা শব্দ এবং প্রচুর ধোঁয়া উদ্গীরণ করা ছাড়া কোন শক্তিই তার নাই—এগুলি সেই শ্রেণীরই বোমা। বিশু তার উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করিল না।

তারপর যখন সে সাঙ্কো পাঞ্জার কবল হইতে সুনন্দার মুক্তির কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিল না, তখন সে এ বোমাগুলাই কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিল। এগুলার সাহায্যে ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়া অনায়াসেই সে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির হইতে পারিবে এবং সুনন্দাকে মুক্ত করিয়া লইয়া উড়ো জাহাজটার সাহায্যে পলায়ন করিবে।

মতলবটা স্থির হইতেই সে বোমার পার্শেলগুলার উপর পিস্তলটা লক্ষ্য করিয়া একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ এবং ধোঁয়ায় জাহাজটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেই সে সিন্দুক হইতে বাহিরে আসিয়া সোজা সুনন্দার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষিপ্রহস্তে সুনন্দার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, উড়ো জাহাজটা কোথায় আছে জানো ত? যেটায় সাঙ্কো পাঞ্জা যাবে, সেটা নয় কিন্তু।

ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে সুনন্দা কহিয়া উঠিল, দুটো জাহাজই পাশাপাশি আছে।

বিশু বলিল, দুটো জাহাজই পাশাপাশি ? তা হোক্, আমরা যাব আর ছুট দোব....

কিন্তু গোপাল আছে যে বাবার জাহাজটায় ?

থাক্, গোপাল, এত ধোঁয়ার ভেতর সে দেখতে পাবে না আমাদের।

কিন্তু এত বড় বিপদের মধ্যে....

এও কি আমরা কম বিপদে পড়ে আছি সুনন্দা ? প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণ সংশয়। তার চেয়ে চল, অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখি, কোন রকমে পালিয়ে যদি সাঙ্কো পাঞ্জার হাত থেকে নিস্তার পাই।

সুনন্দার পরিচিত পথ—ধোঁয়ার মধ্য দিয়াই তারা ছুটিতে লাগিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা গর্জ্জিয়া উঠিল, পটকা ছুড়লে কে ?

উল্লাস মনে করিয়াছিল, অনুচরদের ভিতর নিশ্চয়ই কেহ আনন্দের আতিশয্যে এই কাজ করিয়া বসিয়াছে। তাই সে বলিল, ছুড়েচে আমাদেরই কেউ....

তার কথার মাঝখানেই সাঙ্কো পাঞ্জা অতৃপ্ত শকুনের মত চিটকাইয়া উঠিয়া কহিল, ভারী অন্যায় করেছে। তার শাস্তি....

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে যা ঘটিল, শাস্তির কথাটা সে আর উচ্চারণ করিতে পারিল না। হাঁফাইতে হাঁফাইতে একদল অনুচর হুড়মুড় করিয়া সাঙ্কো পাঞ্জার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্ফারিত চোখ, ভীতি-বিবর্ণ তাদের মুখ। সকলেই প্রায় একই সঙ্গে চাপা গলায় বলিয়া উঠিল, জাহাজ—একটা জাহাজ আসছে সর্দ্দার, তীরের মত গতিতে....

অন্ধকারের ভিতর কিছুই দেখিবার উপায় ছিল না, তবু সাঙ্কো পাঞ্জা মালো ফেলিয়া জাহাজটা দেখিবার চেষ্টা করিল।

হ্যাঁ, সত্যই একটা জাহাজ তীরের মত ছুটিয়া আসিতেছে—সরকারী পুলিশেরই মনে হয়।

ইতিমধ্যে কথাটা বিদ্যুদ্বেগে জাহাজের ভিতর রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল।

ভীত, সন্ত্রস্ত অনুচরের দল চীৎকার করিয়া উঠিল, জাহাজ ছেড়ে দাও, নৈলে... কথাটা তারা আর শেষ করিল না, বোধ করি জাহাজ ছাড়িবার ব্যবস্থা করিতেই ছুটিল।

তাদের অসমাপ্ত কথা শেষ করিল আর এক দল; বিহ্বল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, নৈলে আর রক্ষে নেই, জাহাজ ঘিরে টিপে মেরে ফেলবে।

সাঙ্কো পাঞ্জা কিন্তু ধীর, স্থির, নির্বিকার। মাথার উপর যার মহাবিপদের উদ্যত কৃপাণ ঝুলিতেছে, কিরূপে সে যে এমন নিশ্চিন্ত নির্ভীকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, অনুচরেরা কল্পনা করিতে পারিল না।

... দৃষ্টিতে চতুর্দিকের বিশৃঙ্খলটা দেখিয়া লইয়া সাঙ্কো পাঞ্জা শান্ত কণ্ঠেই কহিল, যদি সত্যিই তোমরা ভয় পাও, তাহলে পালাও, উড়ো জাহাজেই হোক্, আর নৌকোতেই হোক্। আমি থাকছি এ জাহাজে...

উল্লাস প্রতিবাদ করিল, তা হয় না, সর্দার। আমাদের এত কষ্টের ধনরত্নগুলো হাতছাড়া করে ছেড়ে দিতে পারি না। তার চেয়ে আপনি যান, ধনরত্নগুলো নিরাপদে থাকুক, আমরা যেমন করে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছি....

তর্কের সময় ছিল না। অগত্যা সাঙ্কো পাঞ্জা উড়ো জাহাজের

অভিমুখে যাইতে যাইতে কহিল, মরবে, তবু পুলিশের হাতে ধরা দেবে না। আমি বালিগঞ্জেই তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

জাহাজ তীরের গতিতে ছুটিতে সুরু করিয়াছিল। সাঙ্কো পাঞ্জা উঠিতেই উড়ো জাহাজও ছাড়িয়া দিল।

সুনন্দাকে পাশে লইয়া বিশু যে উড়ো জাহাজটায় আসিয়া বসিয়াছিল, কেহই সেটা লক্ষ্য করিল না। সাঙ্কো পাঞ্জার জাহাজ উড়িতেই বিশু তার পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

প্রতুলের 'ওয়ারলেসে' খবর পাইয়াই 'জলবালা' ছাড়িয়া দিয়াছিল। এ ব্যবস্থা করিয়াছিল প্রতুলই।

সাঙ্কো পাঞ্জার জাহাজ যে কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া সাগরে পাড়ি দিতেছে, ইহা সে নিঃসংশয়েই বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই হোটেল হইতে পুলিশ-অফিসে ফোন করিয়া দিল।

ফোন ধরিয়াছিলেন আনন্দমোহন। সাঙ্কো পাঞ্জা এবং তার দলবলকে একসঙ্গে জাহাজে পাইবেন ভাবিয়া আনন্দে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

কমিশনার কিন্তু আপত্তি তুলিয়াছিলেন। এত পুলিশ একসঙ্গে লইয়া সত্যই যদি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয়, তা হইলে লজ্জার ত শেষ থাকিবেই না, দুর্নামেও দেশ ভরিয়া যাইবে।

যুক্তি দিয়া, তর্ক করিয়া এ আপত্তি তাঁর খণ্ডন করিলেন আনন্দমোহনই। বলিলেন, আজ যদি আমরা এ সুযোগ ছেড়ে দি, তাহলে হয়ত আর কোনদিনই সাঙ্কো পাঞ্জা আর তার দলবলকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করতে পারব না।

কমিশনার কহিলেন, আপনি কি মনে করেছেন, সাঙ্কো পাঞ্জা এতই বোকা যে পালাবার কোন মতলব না এঁটেই সে জাহাজে চেপে বসেছে?

আনন্দমোহন একটু ভাবিলেন; বলিলেন, সে পালালেও তার অনুচরদের একসঙ্গে পার ত? তাদের গ্রেপ্তার করতে পারলেও সাঙ্কো পাঞ্জার ডানা ভেঙে যাবে।

অনুচরদের নিয়েই যদি পালায় সে?

এ ত আর ডাঙা নয়, জল।

আমার মনে হয়, ডাঙায় সে বাঘ,জলে কুমীর। অনেক দুর্দ্দান্ত দেখেছি আনন্দমোহন, অনেককে গ্রেপ্তারও করেছি, কিন্তু সাঙ্কো পাঞ্জার মত...

স্থির সংকল্প লইয়া আনন্দমোহন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন, আমার কি মনে হয় জানেন? সাঙ্কো পাঞ্জার বিরুদ্ধে এই আমাদের শেষ অভিযান।

কেন?

প্রতুলবাবুর কথা শুনে তাই মনে হ'ল।

কিন্তু আমি প্রতুলবাবুকে ঠিক অতটা বিশ্বাস করতে পারছি না।

তারও ত এই শেষ।

অবশেষে কমিশনারকে মত দিতেই হইয়াছিল।

জলবালা আসিয়াই উর্ম্মির যাত্রী এবং কর্ম্মচারীদের উদ্ধার করিল। নটিনী তখন বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে।

আনন্দমোহন ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করিলেন, যত দূরেই গিয়ে পড়ুক, ধরতেই হবে নটিনীকে।

কিন্তু ধরিতে হইবে বলিয়াই হয়ত ধরা যাইবে না, দৈব যদি না

তাঁদের অনুকূল হইত। আকাশে দুর্যোগের কোন লক্ষণই ছিল না, হঠাৎ উঠিল ঝড়, ঝড়ের সহিত বৃষ্টি।

মন্ত্রবলে সাগরের চেহারাটাও যেন তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল। অবরুদ্ধ ক্রোধে ফুলিয়া ফুলিয়া সে শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। জাহাজ একবার ডোবে, একবার ভাসে—মোচার খোলের মতই অসহায়।

আনন্দমোহনের কিন্তু কালবৈশাখীর এ তাণ্ডব লীলায় ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, জাহাজ বন্ধ করলে চলবে না ক্যাপ্টেন।

অসহ্য বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ক্যাপ্টেন আনন্দমোহনের দিকে তাকাইলেন; বলিলেন, বলছেন কি আপনি? ঝড়ের মুখে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে কি আমি...

নটিনীকে যে ধরতেই হবে।

ধরতে হবে, ধরব। তারাও নিশ্চয় জাহাজ বেঁধেছে।

আনন্দমোহন সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, জাহাজ বেঁধেছে তারা? তাহলে আপনি এই সুযোগে....

ক্যাপ্টেন প্রতিবাদ করিলেন, সুযোগ নিতে গিয়ে কি আমরা...

আনন্দমোহন দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, কালবৈশাখী মানতে গেলে চলবে না ক্যাপ্টেন। নটিনীকে ধরতেই হবে। তা যদি না পারি, সাগরজলে জাহাজ তলিয়ে গেলেও কোন ক্ষোভ হবে না আমার।

সত্যই। যার জন্য জলবালার এ অভিযান, তা যদি সফল না হয়, ক্যাপ্টেনই বা মুখ দেখাইবেন কি করিয়া? কাজেই জাহাজ যেমন চলিতেছিল, উত্তাল সাগর-বক্ষ ভেদ করিয়া তেমনিই চলিতে লাগিল।

আবার ক্যাপ্তের দূরবীণ চোখে লাগাইয়া বসিলেন, আনন্দমোহন তাঁর পাশে রহিলেন স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া।

নটিনী ভুল করিল। তারা জানিত না, জলবালা প্রস্তুত হইয়াই তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে। পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িতেই আনন্দ-মোহন কামান ছুড়িতে আদেশ দিলেন।

নটিনীতেও কামান ছিল। কিন্তু এই অতর্কিত আক্রমণে তারা আর কামান ব্যবহার করিতে পাইল না।

গভীর হতাশায় উল্লাস চীৎকার করিয়া উঠিল, যে ক'জন পার, উড়ো জাহাজ নিয়ে সরে পড়, সর্দ্দারকে খবর দাও...

কিন্তু কোথায় উড়ো জাহাজ? শত্রুর বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া বৃথাই তারা এদিক-ওদিক খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নটিনী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। নৌকায় চড়িয়া যারা পলায়ন করিতেছিল, তারাও ধরা পড়িল; সর্দ্দারের নিকট এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া লইবার জন্য একটী প্রাণীও অবশিষ্ট রহিল না।

ছাব্বিশ

সাঙ্কো পাঞ্জা বালিগঞ্জে গিয়া অবতরণ করিবে শুনিয়াই ছদ্মবেশী প্রতুল আবার তার পকেট হইতে 'ওয়্যারলেস' বাহির করিল।

আনন্দমোহন জলবালায় আছেন ভাবিয়া এবার সে তার করিল স্বয়ং কমিশনার সাহেবকে।

যথা সময়েই সাঙ্কো পাঞ্জা তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া কহিল, ছেড়ে দাও গোপাল, আর দেরী না।

প্রতুল প্রস্তুত হইয়াই ছিল। দেখিতে দেখিতে উড়ো জাহাজখানা শূন্যমার্গে উঠিল।

সাঙ্কো পাঞ্জা নটিনীর দিকে নির্নিমেষ নেত্রে তাকাইয়াছিল। ক্রমে বিন্দুর মত হইয়া সেটা তার দৃষ্টির মাঝে মিশাইয়া গেল।

তার পর এই ঝড়!

সাঙ্কো পাঞ্জা কহিল, এ ঝড়ে কিছুই হবে না, চালাও গোপাল।

ক্রুদ্ধ পবনের সহিত সমান তালে উড়ো জাহাজটা ছুটিয়া চলিল।

অনতিদূরে আর একটি উড়ো জাহাজ উড্ডীন হইয়াছে দেখিয়া সাঙ্কো পাঞ্জা সবিস্ময়ে কহিল, কে আসছে ও?

প্রতুলও ভাবিয়া পাইল না, কে আসিতে পারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজটার পানে তাকাইয়া কহিল, আমাদেরই 'পুষ্পক' না?

আমাদেরই পুষ্পক? সাঙ্কো পাঞ্জার মুখখানা অকস্মাৎ কুটীল হইয়া উঠিল। তাহলে কে আসতে পারে? প্রতুল লাহিড়ী?

প্রতুলের মুখে ফুটিয়া উঠিল তাচ্ছিল্যের হাসি ; কহিল, প্রতুল লাহিড়ী আসবে কোত্থেকে ?

তার কাছেও অসম্ভব কিছু নেই। সাঙ্কো পাঞ্জা গেল গভীর চিন্তা-সাগরে ডুবিয়া। ঝড়ের বিরুদ্ধে কিছুই করিবার উপায় ছিল না।

সুবিশাল নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশের পানে তাকাইয়া থাকিয়া সুনন্দা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এত ক'রেও আমরা উর্ম্মিকে বাঁচাতে পারলুম না !

বিশু বলিয়া উঠিল, সত্যিই উর্ম্মির দুর্ভাগ্য !

সুনন্দা কহিল, উর্ম্মির দুর্ভাগ্য নয়, আমারই। আজ ভাবছি, প্রতুল বাবু যদি জানতেন....

কিন্তু কোন কথাই সে জানে না। তোমারই অনুরোধ মত যেটুকুও জানতুম আমি, তাকে বলিনি। যদি সে জানত, সাঙ্কো পাঞ্জা এত বড় একটা পৈশাচিক কাজ করতে চলেছে, তাহলে নিশ্চয়ই সে বাধা দেবার চেষ্টা করত।

কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন তিনি ?

নিশ্চয়ই না।

তাহলে উর্ম্মি রক্ষার জন্যে তিনিও ত আসতে পারেন ?

তা পারেন কিন্তু আসবে কখন আর ? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ত উর্ম্মি ডুববে, শুনে এলে।

ঘণ্টাখানেক ত আর কম সময় নয়। হয়ত তিনি ইতিমধ্যে এসে....

তাহলে বড় ভাল হয়, না ?

ভাল হয় বলে? উর্ম্মির হতভাগ্য লোকগুলোও বাঁচে, আর বাবার অনুচরেরা বন্দী হয়।

তোমার বাবাও যদি থাকত তার মধ্যে, আর ভাল হ'ত, না?

সুনন্দা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, না,-না, তুমি জানো না, বাবা আমার কত ভাল, কত স্নেহময়! ওই সব অনুচরেরাই...

এই সব অনুচরদেরও সে তোমার চেয়ে কম ভালবাসে না। তুমি যখন সাঙ্কো পাঞ্জার ছদ্মবেশে ধরা পড়েছিলে, তখন তোমার জ্বর হয়েছিল, না?

হ্যাঁ, হয়েছিল, তুমি জানলে কি করে?

তোমার বাবাই লিখেছিল কমিশনার সাহেবকে, যথাবিধি কপিঞ্জলের সেবা-শুশ্রূষা করতে।....কিন্তু একি! ঝড় উঠল না?

সুনন্দা বিহ্বলের মত কহিয়া উঠিল, তবে নেমে পড় কোথাও....

তা হলে ত সাঙ্কো পাঞ্জার অনুসরণ করতে পারব না। উঠুক ঝড়....

ঝড় উঠিল, থামিয়াও গেল, ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিল উষার আলো। ছদ্মবেশী প্রতুলের মনে আনন্দ যতখানিই হোক, দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না। এত সহজেই সাঙ্কো পাঞ্জা লৌহ-বলয় পরিবে কি?

কিন্তু না পরিয়াই বা উপায় কি? আত্মরক্ষার অবসর পাইবে কোথায়? কমিশনার সাহেব এতক্ষণ নিশ্চয়ই পুলিশ-বাহিনী সঙ্গে লইয়া মাঠে দাঁড়াইয়া আছেন—সাঙ্কো পাঞ্জার প্রতীক্ষায়।

উড়ো জাহাজ অবতরণ করিল। সাঙ্কো পাঞ্জা বাহির হইয়া আসিতেই সাধারণ বেশধারী পুলিশের দল উদ্যত পিস্তল হস্তে তাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

পিস্তলের খোঁজে সাঙ্কো পাঞ্জা পকেটের ভিতর হাত ভরাইতে যাইতেই ছদ্মবেশী কমিশনার গর্জ্জিয়া উঠিলেন, চট্ করে হাত তোল মাথার ওপর....

ননীগোপাল জাহাজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, হাতে তার লৌহ-বলয়। মুহূর্ত্তেই সে সাঙ্কো পাঞ্জার হাতে পরাইয়া দিল।

সাঙ্কো পাঞ্জার জ্বলন্ত চোখ দুটি যেন প্রতুলের মর্ম্মভেদ করিল; বজ্রের মতই সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, গোপালের ছদ্মবেশে নিশ্চয়ই প্রতুল লাহিড়ী আমার সামনে? একমাত্র তোমারই ক্ষমতা ..

ঠিক এমনি সময়েই বিশু আসিয়া অবতরণ করিল: সুনন্দা সহ্য করিতে পারিল না, এ দৃশ্য দেখিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

প্রতুল ছুটিয়া গিয়া বিশুকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দ-চপল কণ্ঠে কহিল, বিশুরে, বিশু···

সাঙ্কো পাঞ্জার চোখ দুটা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।